সাম্যবাদ

তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের দাবিতে
১৫ ফেব্রুয়ারি '১৬ রংপুর-জলঢাকা
তিস্তা রোডমার্চ
বাসদ (মার্কসবাদী)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র ● দ্বিতীয় বর্ষ নবম সংখ্যা ● জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ● পাঁচ টাকা

শাসকশ্রেণীর 'উন্নয়ন' ও 'গণতন্ত্র'

জনগণের জন্য গোরস্থানের শান্তি

৫ জানুয়ারি ২০১৪ সালের ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকার দুই বছর পূর্ণ করলো। এ উপলক্ষে তারা মহাসমারোহে 'গণতন্ত্রের বিজয় দিবস' উদযাপন করলেন। গত দুই বছরে কেমন 'গণতন্ত্র' তারা চালু করেছেন তার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হলো গত ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচন। মানুষ ভোট কতটুকু দিয়েছে বা কাকে দিয়েছে তা বড় কথা নয়, নৌকা প্রতীকের পক্ষে ভোটের বাক্স ভরে গেছে। শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী নাটকের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা একচেটিয়া বিজয় অর্জন করেছেন। সরকারি দল কর্তৃক প্রশাসনের সহযোগিতায় আগের রাতেই ব্যালটে সীল মেরে রাখা, কেন্দ্র দখল, বিরোধী পক্ষের পোলিং এজেন্টদের বের করে দিয়ে গণহারে সীল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি করা, বহিরাগতদের জড়ো করে ব্যাপক জালভোট প্রদান, বিরোধী নেতা-কর্মী ও ভোটারদের ভোটকেন্দ্রের আশেপাশে ভিড়তে না দেয়া, নির্বাচনের আগে থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর লোকজনকে পুলিশি হয়রানি করে এলাকাছাড়া করাসহ নানা কায়দায় পরিকল্পিত ও কৌশলী রিগিং করা হয়েছে। এই নির্বাচন ভিন্ন কৌশলে ৫ জানুয়ারি ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচন এবং বিগত ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেরই ধারাবাহিকতা মাত্র। প্রশাসনিক কারসাজি, বলপ্রয়োগ ও জালিয়াতিপূর্ণ এই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকারকে আরেকবার পদদলিত করা হলো। প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠিত এই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে 'নিরংকুশ বিজয়ের' মাধ্যমে অনির্বাচিত মহাজোট সরকার 'সফলভাবে প্রমাণ' করেছে যে, জনগণের বিপুল সমর্থন তাদের পেছনে আছে।

এই নির্বাচনে ৭৩.৯২ শতাংশ ভোট পড়েছে যা অস্বাভাবিক। প্রথম আলো পত্রিকার তথ্যমতে মেয়র পদে ৮০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে ৭৪টি পৌরসভায় এবং ৭৫ থেকে ৮০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে ৬৩টি পৌরসভায়। তার মানে ২০৭টি পৌরসভার মেয়র পদের মধ্যে ১৩৭টিতে ৭৫ শতাংশের ওপরে ভোট পড়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি পৌরসভায় গড়ে ৯০ শতাংশ ভোট পড়েছে। নলডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট পড়েছে শতভাগ, যেমন ছিল যশোরের এমএম কলেজের কেন্দ্রটিতে। বেলা তিনটার সময় সেখানে ভোট গণনার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। শাসক দল বুঝিয়ে দিচ্ছেন – ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি, ঢাকা-চট্টগ্রামে মেয়র নির্বাচন ও সম্প্রতি পৌরসভায় যেমন নির্বাচন হয়েছে অথবা যা হয়েছে, সেই ধারাই অব্যাহত থাকবে। কারণ, তাদের ভাষায়, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' রক্ষা করতে এবং 'উন্নয়নের ধারা' অব্যাহত রাখতে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে যে-কোনোভাবে ক্ষমতায় রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও সুশাসনে মানুষ খুবই খুশি, তারা এই সরকারকেই ক্ষমতায় দেখতে চায়। আর ৫ জানুয়ারির নির্বাচন এবং এর পরবর্তীতে যা চলছে তাতো 'গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক শাসন' রক্ষার জন্যই। বিএনপি-জামাত ক্ষমতায় আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-গণতন্ত্র-উন্নয়ন-সুশাসন ইত্যাদি অর্জনগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে, দেশ আবার দুর্নীতি-জঙ্গীবাদের কবলে পড়বে। এইসব কথা বলে তারা নিজেদের অনির্বাচিত শাসনকে জায়েজ করছেন। দেখা যাক, প্রকৃত অবস্থা আসলে কেমন?

কী ধরনের গণতন্ত্রের চর্চা হচ্ছে দেশে?

গত দুই বছরে গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্রমাগত সংকুচিত করে দেশে এক স্বৈরতান্ত্রিক নিপীড়নমূলক শাসন কায়েম করা হয়েছে যা সম্পূর্ণভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী। *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংস
ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর মর্যাদা এদেশ কখনোই দিতে পারেনি

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সংগীত জগতে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব, ভারতীয় শাস্ত্রিয় সঙ্গীতে যন্ত্র সঙ্গীত ধারায় হিন্দু-মুসলিম যত শিল্পীই এসেছেন, তাঁর সমকক্ষ আগেও কেউ ছিলেন না, এখনও নেই। প্রায় সকল ধরনের বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন তিনি। সৃষ্টি করেছিলেন সংগীত দল 'মাইহার ব্যান্ড'। এতবড় মহান শিল্পী ছিলেন এই বাঙালি। তাঁর জন্ম বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। সেখানে তাঁর বাড়িতে, যেখানে তিনি মাঝে মাঝে এসে গান শেখাতেন, অনেক গুণী লোকের পদার্পণ হতো, সেই বাড়িতে একটি সংগীত স্কুল ও মিউজিয়াম গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই বাড়িটি কিছু মাদ্রাসা ছাত্র জ্বালিয়ে দিল। তাঁর স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংস করে দিল। এদেশের এত বড় গৌরব সকলের চোখের সামনে এভাবে অপমানিত হলেন।

এই দেশে কখনই তাকে বুঝতে পারার মতো মানুষ দেখা যায়নি। বর্তমানে বাংলাদেশে যে বুদ্ধিজীবী-শিক্ষিত লোক, শিল্পী-সাহিত্যিকরা আছেন, তাদের গুণের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, তাদের বুঝতে পারার মতো ক্ষমতা নেই যে, তিনি কত *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

স্কুলে স্কুলে বেতন ও ভর্তি ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ
চট্টগ্রামে পুলিশি বাধা

জানুয়ারি মানেই তো শিশু কিশোরদের নতুন ক্লাস, নতুন বই। নতুন ক্লাসে ওঠা আর নতুন বইয়ের গন্ধ সবারই স্বপ্ন। আমাদের দেশে এই স্বপ্ন এখন অভিভাবকের দুঃস্বপ্ন। স্কুলের বিপুল ভর্তি ফি, উচ্চ বেতন, কোচিং-গাইডের খরচের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষা সোনার হরিণে পরিণত হচ্ছে। কায়েম করা হয়েছে 'টাকা যার শিক্ষা তার' নীতি। এই নীতির বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করছে। তারই ধারাবাহিকতায় চট্টগ্রামে সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তুকি কমিয়ে বেতন-ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন পরিচালনা করে ছাত্র ফ্রন্ট।

'এক টাকাও বাড়তি ফি ছাত্র সমাজ দেবে না' এ স্লোগান আজ সারাদেশেই উঠেছে। শুরুটা হয়েছে সূর্যসেন আর প্রীতিলতার চট্টগ্রামে। চসিকের নতুন মেয়র তার আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নেয়ার আগেই আক্রমণ করে বসলেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে। ২০ মে '১৫ তারিখে ঘোষণা দিলেন চসিক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তুকি কমিয়ে বেতন-ফি বাড়ানো হবে। এই অযৌক্তিক অগণতান্ত্রিক প্রস্তাব প্রত্যাহারের দাবিতে ছাত্র ফ্রন্ট লাগাতার আন্দোলনের ঘোষণা দেয়। তারই অংশ হিসেবে চট্টগ্রামে গণস্বাক্ষর *(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রেলের ভাড়া বৃদ্ধি কেন?

পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাসের মূল্য বাড়ছে, বাড়িভাড়া-গাড়িভাড়া লাফিয়ে বাড়ছে। বাড়ছে না জনগণের আয়। এ অসহনীয় পরিস্থিতিতে গত ১৪ জানুয়ারি রেলমন্ত্রী রেলের যাত্রী ও পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছেন। যা প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন দিলে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কার্যকর করা হবে। ৭.৮% থেকে সর্বোচ্চ ১৫%(দূরত্ব অনুসারে) ভাড়া বাড়বে। এখানেই শেষ নয়, রেলমন্ত্রী বলেছেন এখন থেকে প্রতি বছর ভাড়া বাড়বে। রেল কর্মকর্তারা বলেছেন, সড়কপথের সাথে সঙ্গতি রাখতে ভাড়া বাড়ানো দরকার।

গত ২০১২ সালেও যাত্রীসেবা বৃদ্ধি ও লোকসান কমানোর কথা বলে প্রায় দ্বিগুণ ভাড়া বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু যাত্রীসেবার মান বাড়েনি, লোকসানও কমেনি। ২০১২ সালে রেলের লোকসানের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৮০০ কোটি টাকা। ভাড়া বাড়ানোর পরও বর্তমানে লোকসান হচ্ছে বার্ষিক ৯০০ কোটি টাকা। তাহলে আবারো ভাড়াবৃদ্ধি কি লোকসান কমাবে, নাকি সাবেক রেলমন্ত্রীর কথিত রেলে 'দুর্নীতির কালো বিড়াল' ধরা দরকার আগে?

বলা হচ্ছে, ভর্তুকি দেওয়া সম্ভব নয় বলে ভাড়া বাড়াতে হচ্ছে। অথচ আমরা দেখি কুইক রেন্টাল বিদ্যুতের জন্য জনগণের ট্যাক্সের টাকায় অল্প কয়েকজন ব্যবসায়ীকে হাজার হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। সাংসদদের শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানিতে হাজার হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড় দেওয়া হয়েছে। অথচ সাধারণ মানুষের জন্য কোন ছাড় নেই। পাঁচ কোটি মানুষের যাতায়াতের জন্য ভাড়া না বাড়িয়ে এ টাকা কি *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

৪র্থ কেন্দ্রীয় সম্মেলন
৩০ মার্চ '১৬ বুধবার
অপরাজেয় বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রধান বক্তা : কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী
সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

শাসকশ্রেণীর ‘উন্নয়ন’ ও ‘গণতন্ত্র’ : জনগণের জন্য গোরস্থানের শান্তি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) মহাজোট সরকার জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। সমগ্র নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং এর ন্যূনতম বিশ্বাসযোগ্যতাকে তারা ধ্বংস করেছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও সভা-সমাবেশের গণতান্ত্রিক অধিকারকেও নানাভাবে হরণ করে চলেছে। দেশকে তারা এক ধরনের পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড-গুম-নির্যাতন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। বিচার ব্যবস্থাসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর সরকারের কর্তৃত্ব আরও জোরদার করা হয়েছে। গণমাধ্যমসহ সোশ্যাল মিডিয়াকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

প্রাইমারি থেকে এসএসসি, এইচএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়াটা নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মেডিকেলের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। কিন্তু সরকার প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া তো দূরে থাক, স্বীকারই করেনি। সরকারের অনেক কাজের পক্ষে থাকা শিক্ষাবিদ ড. জাফর ইকবালের মতো মানুষও বলতে বাধ্য হচ্ছেন, ‘এই সরকারের সময় শিক্ষাব্যবস্থার যে ক্ষতি হলো, তা অতীতের কোনো সরকারের সময় হয়নি।’ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ শিক্ষকদের মর্যাদা প্রশাসনিকভাবে নামিয়ে দেয়ার মতো কাজও করেছে এই সরকার। নারী নির্যাতন-যৌন নির্যাতন বাধাহীনভাবে চলছে। পহেলা বৈশাখে নারী লাঞ্ছনার ঘটনারও কোনো বিচার হয়নি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও অত্যন্ত নাজুক।

উন্নয়নের কথা বলে গণতন্ত্রকে বনবাসে পাঠানো হয়েছে। অথচ সীমাহীন দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, ব্যাংক লুট, অর্থ পাচার, দলীয়করণ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি অতীতের বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের মতো বর্তমান সরকারেরও বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ব্যাংক লোপাটসহ অনেক ক্ষেত্রে তারা অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম দুই-তৃতীয়াংশ কমার পরেও দেশে কমানো হয়নি, বরং বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম দফায় দফায় বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি খরচের বোঝা চাপানো হচ্ছে। এখন আবার রেলের ভাড়া বাড়ানোর ঘোষণা এসেছে। পুরো দেশের খাদ্যের যোগান দেওয়া কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। প্রবাসী শ্রমিকরা দেশে টাকা পাঠাচ্ছে, কিন্তু মানবপাচারকারী চক্রের প্রতারণা বা অন্যায় শ্রমশোষণের কবল থেকে তাদের রক্ষায় সরকারের কোনো ভূমিকা নেই। শিক্ষা-চিকিৎসাসহ সেবাখাতের বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ চলছে। উন্নয়নের নামে সমস্ত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে মহাজোট সরকার প্রাকৃতিক রক্ষাকবচ ও বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের পাশে রামপালে বৃহদায়তন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো পরিবেশবিধ্বংসী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ভারতের সাথে যৌথভাবে। রাশিয়ার ঋণ ও প্রযুক্তিতে বিপুল ব্যয়ে রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে যা ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকা ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে নিয়ে আসতে পারে। এর সাথে জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় তো থাকছেই। ‘বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল’ স্থাপন করতে হবিগঞ্জে চা-বাগানে বংশপরম্পরায় বসবাসরত হতদরিদ্র চা-শ্রমিকদের তাদের কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

সরকারি প্রশাসন-পুলিশ-সেনাবাহিনীকে হাতে রাখতে তাদের বেতন-বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে, কিন্তু সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গার্মেন্টসকর্মীসহ শ্রমিকরা মানুষের মতো বাঁচার উপযোগী মজুরি পাচ্ছে না। এত শোষণের পরও চীনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি যেখানে ৫০০ ডলার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনামে যেখানে গড়ে ৩০০ ডলার – সেখানে বাংলাদেশে ৭০ ডলারেরও কম। বিদেশী ক্রেতারা তাদের বাজারে ৩৫ ডলারে যে পোশাক বিক্রি করে তা তারা এখানে তৈরি করিয়ে নিতে গড়ে ৫ ডলার খরচ করে, আর এদেশের মালিকরা সেই পোশাক প্রতি শ্রমিকদের ৩৫ সেন্ট করে মজুরি দেয়। ফলে বোঝা যাচ্ছে শোষণের চিত্র কতটা প্রকট।

বাংলাদেশ নিম্ন আয় থেকে মধ্য আয়ের দেশ হয়েছে – মহাজোট সরকারের বিরাট সাফল্য হিসেবে তা প্রচার করা হচ্ছে। তারা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখাচ্ছে – দেশে মাথাপিছু আয় বেড়েছে, জিডিপি প্রবৃদ্ধি অনেক দেশের তুলনায় বেশি। তথ্য কি সবসময় প্রকৃত চিত্রকে প্রতিফলিত করে? বিশ্বব্যাংকের মানদণ্ড অনুযায়ী পর পর তিন বছর মাথাপিছু আয়ের গড় ১,০৪৫ ডলার হলেই বিশ্বব্যাংক তাকে মধ্যম আয়ের দেশ বলে গণ্য করবে। সরকারি হিসাবে বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু গড় আয় ১,৩১৪ ডলার। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১৫) মতে, জিডিপির আকার ১৫ লাখ ১৩ হাজার ৬ শত কোটি টাকা। এই হিসাবে দেশের ১৬ কোটি লোকের প্রত্যেকের মাথাপিছু আয় হবে বার্ষিক ৯৫ হাজার টাকা, মাসিক প্রায় ৮ হাজার টাকা। অর্থাৎ, বাংলাদেশে ৪ সদস্যের যে-কোনো পরিবারের মাসিক আয় প্রায় ৩২ হাজার টাকা। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি তাই? সুতরাং সরকার মাথাপিছু আয়ের যে পরিসংখ্যান দিচ্ছে সেটি কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তার মধ্যে রয়েছে বিরাট শুভঙ্করের ফাঁকি।

তাই মধ্যম আয়ের দেশের গল্পে জনগণের কোনো লাভ নেই। পরিসংখ্যান, বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অথবা বিদেশী বিশ্লেষকদের প্রশংসাপত্র, কোনোটাই বাস্তব চিত্রকে উল্টে দিতে পারে না। যে নিদারুণ দারিদ্র্য ও বেকারত্ব লক্ষাধিক মানুষকে ভয়ংকর সমুদ্র পথে ঠেলে দিয়েছে, যে দুর্বিষহ জীবনযন্ত্রণা বারবার গার্মেন্টস শ্রমিকদের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে – তাকে তো ছোট করে দেখানো যাবে না। বিশ্বব্যাংকের দেয়া মর্যাদা অথবা পরিসংখ্যানের অংকের চেয়ে খালি চোখে যা মানুষ দেখে, সেটাই সত্য, সেটাই বাস্তব। জনগণ সেটাই বিশ্বাস করবে।

মহাজোট সরকারের গণবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক শাসনের সুযোগে দেশে জঙ্গিবাদী-মৌলবাদী তৎপরতার জমিন বিস্তৃত হচ্ছে। শিয়া মুসলিম-খ্রীস্টান সম্প্রদায়-কাদিয়ানী-বাহাইসহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আক্রমণের শিকার হচ্ছে, লেখক-প্রকাশক-বিদেশি নাগরিকদের ঘোষণা দিয়ে খুন করা হচ্ছে। জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো যেমন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চক্রের সঙ্গে যুক্ত, আবার দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতও এদের পেছনে আছে। কারণ এই সংগঠনসমূহ বুর্জোয়াদের পক্ষে পরিস্থিতি তৈরি করতে সহায়তা করে। এসব কারণে দেশে আজ নিরাপত্তাহীন ভীতিকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

তথাকথিত উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে কারা? কাদের স্বার্থে দেশ পরিচালিত হচ্ছে?

উন্নয়নের তথ্য যা প্রচারিত হচ্ছে তাতে দেশের বেশিরভাগ মানুষেরই কোনো সংযোগ নেই। উন্নতি হচ্ছে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণীর। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে শুধু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে এক কোটি টাকার বেশি আমানত রয়েছে এমন হিসাবের সংখ্যা ৪৯ হাজার ৫৫৪। ২০১৩ সালের জুন শেষে ব্যাংকিং খাতে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা ছিল ৪৬ হাজার ১৩৫ জন। ৬ মাসের ব্যবধানে কোটিপতি আমানতকারীর সংখ্যা বেড়েছে ৩ হাজার ৪১৯ জন। ২০০৯ সালে কোটিপতি ছিল ২৩ হাজার ১৩০ জন। পাঁচ বছরে কোটিপতি আমানতকারী বেড়েছে ২৬ হাজার ৪২৪ জন। দেশে ৭২ সালে ছিল মাত্র ৫ জন কোটিপতি – জোট-মহাজোট-সামরিক-বেসামরিক সবার শাসনে ও উন্নয়নে বর্তমানে কোটিপতির সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার।

বাংলাদেশের দ্রুত বড় হওয়া অতি ধনী ও সুবিধাভোগীদের চিত্র ফুটে উঠেছে ওয়ার্ল্ড আল্ট্রা ওয়েলথ রিপোর্ট-২০১৩-এ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ন্যূনতম ৩ কোটি ডলার বা ২৫০ কোটি টাকা সম্পদধারীর সংখ্যা ৯০। তাদের কাছে গচ্ছিত মোট সম্পদের পরিমাণ ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার বা ১ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা, যা মোট জিডিপির ১২ শতাংশ। এক বছর আগে এমন ধনীর সংখ্যা ছিল ৮৫। তাদের কাছে গচ্ছিত সম্পদ ছিল ১ হাজার ৩০০ কোটি ডলার বা ১ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকার। এসব হিসাব থেকে দেখা গেছে, ন্যূনতম ৩ কোটি ডলার সম্পদ আছে এমন অতি ধনী ২০০৯ সালে ছিলেন সর্বোচ্চ ৫০ জন। ২০১৪ সালে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের জমানো টাকার পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি ৮০ লাখ ফ্রাঁ (চার হাজার ৪৫৪ কোটি টাকার সমান)। তার আগের বছর (অর্থাৎ ২০১৩ সালে) এটা ছিল তিন হাজার ২৩৬ কোটি টাকার সমান সুইস মুদ্রা। ২০১৪ সালের ‘বিআরটিএ’ প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী এক কোটি টাকার বেশি দামের গাড়ির সংখ্যা ৪৯ হাজার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ ওয়েলফেয়ার মনিটরিং সার্ভে অনুযায়ী, মাত্র ৪ দশমিক ২ শতাংশের হাতেই দেশের সম্পদের সবচেয়ে বড় অংশ, ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ।

দেশের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ সম্পদ দেশের মাত্র ৪ শতাংশ লোকের হাতে কিভাবে গেল? কাদের হাত থেকে সম্পত্তি এই স্বল্প-সংখ্যক লোকের হস্তগত হয়েছে? দেখা যাবে যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা সম্পদ হারিয়ে রাস্তায় বসে যাচ্ছে। দরিদ্র চাষী জমি হারিয়ে ভূমিহীন হয়েছে, মাঝারী চাষী দরিদ্র চাষীতে পরিণত হয়েছে। কুমার, কামার, মুচি, তাঁতী, কারিগর ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেশার লোক যারা দক্ষতা বিক্রি করে জীবনধারণ করতো তারা তাদের কাজের ক্ষেত্র থেকে উচ্ছেদ হয়ে শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। আর তাদের শ্রমকে কীভাবে নিংড়ে নিয়ে মালিকশ্রেণী লাভ করছে তা গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতনের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

এই নির্মম শোষণের সাথে আছে রাষ্ট্রিয় সম্পদের যথেচ্ছা লুটপাট। যার ফলাফল হল জনগণের ওপর চেপে বসা অভাব ও দারিদ্র্য। দেশ থেকে এক বছরে পাচার হয়েছে কমপক্ষে ৭৬ হাজার কোটি টাকা। ১০ হাজার কোটি টাকার পদ্মাসেতু বারবার বাজেট বাড়িয়ে ২৮ হাজার কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগামীতে খরচ আরও বাড়ানো হবে। চার লেন সড়ক, ফ্লাইওভারগুলোর খরচ একেকবার কয়েকশ কোটি টাকা করে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। প্রায় ছয়শ কোটি টাকার হাতিরঝিল প্রকল্পে ইতিমধ্যে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। এই যে লুটপাট, অর্থ পাচার – এসব তো জনগণেরই অর্থ। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের সাফল্যের আড়ালে ব্যাংক থেকে ১০ থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা লুটের বিষয় চাপা পড়ে গেছে। চাপা পড়ে গেছে শেয়ারবাজার কেলেঙ্কারি। বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার চুক্তি, অস্ত্র কেনার চুক্তি করা হচ্ছে। এই ঋণের বোঝা টানতে হবে জনগণকেই। দুর্নীতির মাধ্যমে এসব খাত থেকে অর্জিত অর্থ চলে যাচ্ছে অল্প কিছুসংখ্যক মানুষের পকেটে।

যে দেশ থেকে এত হাজার কোটি টাকা লুট হয় সে দেশকে কে গরিব বলবে? যদিও সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো’ই বলছে, জনসংখ্যার ২৫.৬ শতাংশ দরিদ্র। সরকারি পরিসংখ্যান একটু কমিয়েই বলে। তবু যা বলেছে, সেই সংখ্যাটাও বিরাট। প্রায় চার কোটি। পৃথিবীর বহু দেশের জনসংখ্যাও এর চেয়ে কম। এরা ঠিক মতো খেতে পায় না, শিক্ষা-চিকিৎসা-স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান-বিশুদ্ধ পানি এসব তো আরো দূরের ব্যাপার। অন্য আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, চলমান ‘উন্নয়নের’ ব্যবস্থায় ৭৫ শতাংশ মানুষই বড় ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কোনোভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে দিন পার করছে ৫ কোটি ৪৫ লাখ ৬০ হাজার মানুষ। আর দারিদ্র্য নিত্যসঙ্গী এমন মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি ১০ লাখ ৪০ হাজার। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিতের সংখ্যা দেড় কোটি মানুষ।

অন্যদিকে, ব্যাংকিং খাতে এখন অতিরিক্ত তারল্য আছে এক লাখ কোটি টাকারও বেশি। কয়েক বছর ধরে অলস টাকার এই পরিমাণ বেড়েই চলেছে। কিন্তু ঋণ নিচ্ছেন না শিল্পোদ্যোক্তারা, দেশে নতুন বিনিয়োগ তেমন হচ্ছে না। ‘তারল্য’, ‘অলস টাকা’ – এসব শব্দ শুনে আমরা অনেকেই বুঝতে পারব না এ শব্দগুলোর আড়ালে কি আছে। এগুলো বলছে, দেশে শিল্পায়ন তেমন হচ্ছে না। যার অর্থ দেশে সাধারণ মানুষের জন্য নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না। বেকারত্ব বাড়ছে। অথচ আওয়ামী মহাজোট প্রত্যেক ঘরে ঘরে চাকুরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের ভোট নিয়েছিল।

৪ শতাংশ মানুষের স্বার্থে যে দেশ পরিচালিত হয়, সেটি গণতান্ত্রিক হতে পারে না

দেশের মানুষকে নির্মম শোষণ করে, দেশের সম্পদ লুট করে এই ৪ শতাংশ মানুষ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তারা বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা শ্রমের কেন্দ্র বানিয়েছে এই দেশকে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিসমূহকে আহবান করা হচ্ছে যাতে তারা দেশীয় বুর্জোয়াদের সাথে মিলে এখানে বিনিয়োগ করে। তাছাড়া এদেশের পুঁজিপতিরা বিদেশে পণ্য রপ্তানী করে বিরাট মুনাফা করছে এবং তা আরও বাড়াতে চায়। তৈরি পোশাক শিল্প সবচেয়ে বেশি রপ্তানীর ক্ষেত্র, সেখানকার শ্রমিকদের অবস্থা আমরা বলেছি। উল্লেখযোগ্য রপ্তানী ঘটছে ওষুধ শিল্পে, সিমেন্ট শিল্পে, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্পে, প্লাস্টিক শিল্পে। এসব আবার দেশের মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয় দেশের উন্নতি বলে। কিন্তু সত্য এই যে, যাদের শ্রমে এসকল দ্রব্য প্রস্তুত হয় তারা এর মালিক নয়। তাদের শ্রমের পুরোটাই আত্মসাৎ করা হয়। মজুরি যা দেয়া হয় তা শুধু কোনরকমে জীবনধারণের জন্য, যাতে আরও অধিক মুনাফা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এদের শ্রমকে ব্যবহার করা যায়।

এই মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির স্বার্থরক্ষাকারী সরকার কখনও গণতান্ত্রিক হতে পারে না। আবার সারা দুনিয়ায় যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র চলছে তাতে দেশের বেশিরভাগ সম্পদের নিয়ন্ত্রণকারী সেই স্বল্প সংখ্যক পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা ব্যতিরেকে কেউ এই প্রচলিত পার্লামেন্টারি পথে ক্ষমতায় আসতেও পারে না। দেশের ও দেশের মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী সরকার ক্ষমতায় আসতে হলে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় বিপ্লবের মাধ্যমে এই পুঁজিপতিশ্রেণীকে উচ্ছেদ করেই আসতে হবে।

বর্তমান সময়ে সরকারি দল ও প্রধান বিরোধী দল ঢাকাসহ সারাদেশে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫ জানুয়ারির দুই বছর পূর্তি পালন করেছে। একদলের কাছে ৫ জানুয়ারি ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার দিবস, অন্যদলের কাছে গণতন্ত্র হত্যা দিবস। ৫ জানুয়ারিতে সরকার ও বিরোধী পক্ষের এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখে অনেকে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে এবং এদেশের বুর্জোয়া শাসকদের বর্তমান প্রবণতা থেকে আমরা বলতে পারি যে, শাসকদের এই শান্তি জনগণের জন্য ভয়াবহ বিপদ ও দুর্যোগ ডেকে নিয়ে আসছে। কেননা, কথায় বলে, গোরস্থানের মতো শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আর কোথাও নেই। শাসকশ্রেণী দেশের মাটিতে সেই গোরস্থানের শান্তিই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। প্রতিবাদ নেই, বিক্ষোভ নেই – জনগণকে হীনবল ও হতাশ করে দিয়ে মুখ বুজে সমস্ত অন্যায় মেনে নেওয়ার পরিবেশ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজকের দিনে বুর্জোয়াশ্রেণী ‘উন্নয়ন’ ও ‘গণতন্ত্র’ বলতে এই পরিবেশই বোঝে। এ পরিবেশকে ভেঙ্গে সম্পূর্ণ মুক্ত ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য তাই জনগণকে গণআন্দোলন গড়ে তোলার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

চা বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, বিশেষ কোটা চালু এবং শ্রমিকদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে

‘চা-বাগান শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ’ এর উদ্যোগে প্রতি বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, উচ্চ শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে ‘বিশেষ কোটা’ পদ্ধতি চালু এবং চা শ্রমিকদের ভূমির অধিকার নিশ্চিত করাসহ ৫ দফা দাবিতে ২ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় সিলেট নজরুল একাডেমিতে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠক অধীর বাউরীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন গণতন্ত্রী পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ব্যারিস্টার আরশ আলী, সুশাসনের জন্যে নাগরিক (সুজন) সিলেট জেলার আহ্বায়ক ফারুক মাহমুদ চৌধুরী, বাসদ (মার্কসবাদী) নেতা এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক সরকার সোহেল রানা, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক হৃদেশ মুদি, সংগঠক সঞ্জয় কান্ত দাস, হাবিবনগর চা বাগানের প্রসেনজিৎ ছত্রী, গুলনী চা বাগানের মনিরাম কুর্মী, ধামাই চা বাগানের বিপ্লব নায়েক, বুড়জান চা বাগানের সজল গোয়ালা, ছড়াগাং চা বাগানের প্রিয়াংকা কর প্রমুখ। সভায় উপস্থিত ছিলেন এম.সি কলেজের গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জায়েদা খানম শিনি এবং ‘কী নোট পেপার’ পাঠ করেন মালনীছড়া চা বাগানের স্মৃতি রাণী মুদি।

রাষ্ট্র ও বিপ্লব ..... ভি. আই. লেনিন

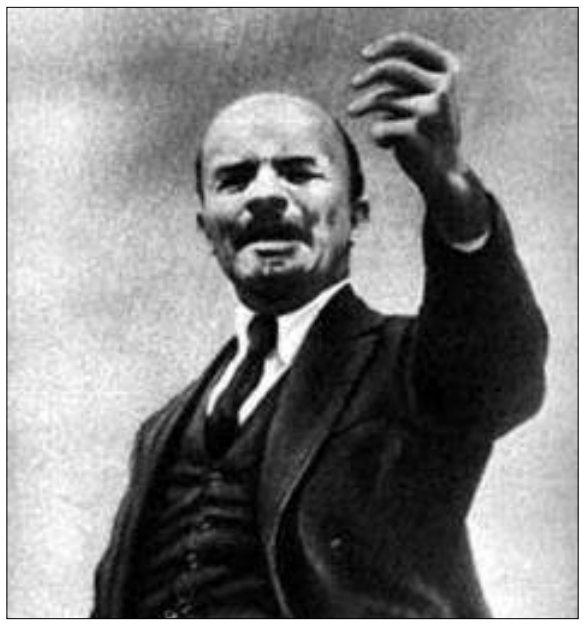

প্রথম রুশ সংস্করণের ভূমিকা

তত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে, উভয়তই রাষ্ট্রের প্রশ্ন বর্তমানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্র অধিকতর দ্রুত ও তীব্র বেগে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিতন্ত্রে রূপান্তর লাভ করিতেছে। সর্বশক্তিমান পুঁজিদার সঙ্ঘগুলির সহিত রাষ্ট্রশক্তি ক্রমশই অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়িতেছে; মেহনতী জনগণের উপর এই রাষ্ট্রশক্তি কর্তৃক বীভৎস উৎপীড়ন ক্রমশই আরও বীভৎস হইয়া উঠিতেছে। উন্নত দেশগুলি – এখানে আমরা দেশের ভিতরকার কথা বলিতেছি – মজুরদের কারাগারে পরিণত হইতেছে, যেখানে তাহাদের সামরিক বন্দীর ন্যায় পরিশ্রম করিতে হয়। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের অভূতপূর্ব দুর্দশা ও বিভীষিকার ফলে জনগণের অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে, এবং তাহাদের বিক্ষোভ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। একটা আন্তর্জাতিক মজুর-বিপ্লব স্পষ্টতই পাকাইয়া উঠিতেছে। রাষ্ট্রের সহিত এই বিপ্লবের কী সম্পর্ক, সেই প্রশ্নও তাই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগে সুবিধাবাদের উপাদানগুলি একসঙ্গে জোড়া হইবার ফলে, সারা দুনিয়ার সরকারী সোসালিস্ট দলগুলির মধ্যে সোসাল-শভিনিস্ট* প্রবণতা দেখা দিয়াছে। এই প্রবণতা – মুখে সমাজতন্ত্র আর কাজে জাতীয়তাবাদ – (রাশিয়াতে প্লেখানভ, পোত্রেসভ, ব্রেশকোভস্কায়া, রুবানোভিচ এবং সামান্য প্রচ্ছন্নভাবে ৎসেরেতেলি, চের্নভ প্রভৃতি; জার্মানিতে শাইদেমান, লেগীন, ডেভিড প্রভৃতি; ফ্রান্স ও বেলজিয়ামে রেনোদেল, গেদ, ভান্দেরভেলদে; ইংল্যান্ডে হাইন্ডমান ও ফেবিয়ানরা ইত্যাদি ইত্যাদি)।

সমাজতন্ত্রের এই নেতাদের এই যে প্রবণতা মূর্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহার বিশিষ্ট লক্ষণ হইল এই যে, ইহারা শুধু 'তাহাদের' জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের সহিতই নয়, 'তাহাদের' রাষ্ট্রের স্বার্থের সহিতও হীনভাবে গোলামের মতো নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছে; কারণ তথাকথিত বৃহৎ শক্তিগুলির অধিকাংশই দীর্ঘকাল যাবৎ কতকগুলি ক্ষুদ্র ও দুর্বল জাতিকে শোষণ করিতেছে এবং দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এই ধরনের লুটের মাল ভাগাভাগির যুদ্ধ। সাধারণভাবে বুর্জোয়াশ্রেণীর, বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রভাব হইতে মেহনতী জনগণের মুক্তির সংগ্রাম রাষ্ট্র সম্পর্কে সুবিধাবাদিসুলভ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতীত অসম্ভব।

প্রথমে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষা আলোচনা করিব; তাঁহাদের শিক্ষার যে সব দিক সুবিধাবাদীরা বিকৃত করিয়াছে অথবা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি, বিশেষভাবে সেই সব দিকের পূর্ণ আলোচনা আমরা করিব। তারপর, যাহারা মার্কস ও এঙ্গেলসের শিক্ষা বিকৃত করিয়াছে, তাহাদের মুখ্য প্রতিনিধি কার্ল কাউটস্কির মতামত বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিব; দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের (১৮৮৯-১৯১৪) নেতা রূপে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত এই কার্ল কাউটস্কি বর্তমান যুদ্ধের সময় অতি-করুণ রাজনৈতিক দেউলিয়া মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। সর্বশেষে প্রধানত ১৯০৫ সালের বিশেষত ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। বিপ্লবের বিকাশের প্রথম স্তর (১৯১৭ সালের আগস্ট মাসের প্রারম্ভে) স্পষ্টতই সম্পূর্ণ হইতেছে; কিন্তু সাধারণভাবে ইহাই বলিতে হয় যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ফলে যে সব সমাজতান্ত্রিক মজুর-বিপ্লব ঘটিতে যাইতেছে, এই বিপ্লবকে সেই বিপ্লব-শৃঙ্খলের একটি গ্রন্থিরূপে বিচার করিলেই ইহার সমগ্রতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে; সুতরাং রাষ্ট্রের সহিত সমাজতান্ত্রিক মজুর-বিপ্লবের সম্পর্ক কী, এই প্রশ্ন যে কেবল ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রেই গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাই নয়, আজিকার দিনের এক জরুরী সমস্যা হিসাবেও প্রশ্নটি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে; অদূর ভবিষ্যতেই পুঁজিতন্ত্রের জোয়াল হইতে মুক্তি লাভের জন্য জনগণকে কী করিতে হইবে, আজিকার দিনের জরুরী সমস্যা হইল জনগণের নিকট সেই কর্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া বলা।

ভ. ই. লেনিন
আগস্ট, ১৯১৭

প্রথম অধ্যায়

শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র

১। রাষ্ট্র শ্রেণী বিরোধ সমাধানের অসম্ভাব্যতার ফল

বর্তমানকালে মার্কসের মতবাদের ক্ষেত্রে যাহা ঘটিতেছে, মুক্তিসংগ্রামরত নিপীড়িত শ্রেণীদের অন্যান্য চিন্তানায়ক ও নেতাদের মতবাদের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের গতিপথে প্রায়শ তাহা-ই ঘটিয়াছে। মহান বিপ্লবীদের জীবদ্দশায় উৎপীড়ক শ্রেণীরা নির্মমভাবে তাঁহাদের নির্যাতন করে, তাঁহাদের শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ-দুষ্ট বৈরিতা ও হিংস্র ঘৃণা প্রকাশ করে এবং নির্বিচারে তাঁহাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কুৎসার অভিযান চালায়। মৃত্যুর পরে এইসব বিপ্লবীকে নিরীহ দেব-বিগ্রহে পরিণত করিবার, সাধু সিদ্ধপুরুষরূপে গণ্য করিবার চেষ্টা হইয়া থাকে; নিপীড়িত শ্রেণীদের 'সান্ত্বনা'র জন্য এবং তাহাদের প্রতারণার উদ্দেশ্যে এই-সব বিপ্লবীর নামের সহিত একটা জৌলুস জুড়িয়া দেওয়া হয়; সেই-সঙ্গে তাঁহাদের বৈপ্লবিক মতবাদের মর্মবস্তুকে ছাঁটিয়া দিয়া তাহাকে নিবীর্য খেলো করা হয়, তাহার বৈপ্লবিক তীক্ষ্ণতা ভোঁতা করিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানকালে বুর্জোয়ারা এবং মজুর আন্দোলনের অন্তর্গত সুবিধাবাদীরা মার্কসবাদ 'সংশোধনে'র কাজে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতেছে। তাহারা মার্কসীয় শিক্ষার বৈপ্লবিক মর্মকেই পরিহার করে, মুছিয়া ফেলে ও বিকৃত করে। বুর্জোয়াশ্রেণীর নিকট যতটুকু গ্রহণযোগ্য হইতে পারে বলিয়া বোধ হয়, ততটুকুই মাত্র ইহারা প্রকাশ্যে তুলিয়া ধরে ও জোর গলায় তাহার প্রশংসা করে। সব সোসাল–শভিনিস্টই* আজকাল মার্কসবাদী – ঠাট্টা নয়! জার্মানির বুর্জোয়া অধ্যাপকেরা যাঁহারা মাত্র গতকালও মার্কসবাদ উচ্ছেদের কাজে পারদর্শী ছিলেন, তাঁহারাই আজকাল 'জাতীয় জার্মান' মার্কসের কথা ঘন ঘন বলিতেছেন; আর যে মজুর-ইউনিয়নগুলিকে একটা পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধ পরিচালনার স্বার্থে চমৎকার সংগঠিত দেখা যাইতেছে, তাঁহাদের মতে, মার্কস-ই নাকি মজুর-ইউনিয়নগুলিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন!

এই রকম অবস্থায় যখন ব্যাপকভাবে মার্কসবাদের বিকৃতি চলিতেছে, তখন রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসের প্রকৃত শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য। এই জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনা হইতে বহু দীর্ঘ উদ্ধৃতির প্রয়োজন হইবে। অবশ্য দীর্ঘ উদ্ধৃতির ফলে গ্রন্থ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে, এবং সাধারণের পক্ষে সহজপাঠ্য হইবে না; কিন্তু তথাপি দীর্ঘ উদ্ধৃতি বর্জন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের (*অর্থাৎ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের – স.*) উদ্ভাবকদের সমগ্র মতামত ও সেই মতামতের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পাঠক যাহাতে স্বাধীনভাবে একটা ধারণা গঠন করতে পারেন, এবং বর্তমান কাউটস্কিপন্থীদের হাতে সেই-সব মতামতের যে বিকৃতি ঘটিতেছে কাগজে-কলমে তাহা যাহাতে সর্বসমক্ষে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় সেই জন্য মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনায় রাষ্ট্রের কথা যেখানে আছে সেই সমস্ত অংশ-ই, অন্তত সর্বাপেক্ষা সার অংশগুলি যথাসম্ভব পুরোপুরি অবশ্যই উদ্ধৃত করিতে হইবে।

'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' নামক এঙ্গেলসের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ লইয়াই শুরু করা যাক; ১৮৯৪ সালে স্টুটগার্টে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মূল জার্মান ভাষা হইতে উদ্ধৃত অং তরজমা করিয়া লইতে হইবে; কারণ রুশ ভাষায় এই গ্রন্থের বহু তরজমা থাকিলেও, অধিকাংশ স্থলেই সে- সব তরজমা অসম্পূর্ণ, অথবা আদৌ সন্তোষজনক নয়।

এঙ্গেলস তাঁহার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্তসার দিতে গিয়া বলিয়াছেন :

"অতএব রাষ্ট্র বাহির হইতে সমাজের উপর আরোপিত একটি শক্তি কোনও ক্রমেই নয়; হেগেল বলিতেন, রাষ্ট্র 'নৈতিক বোধের বাস্তব রূপ', রাষ্ট্র 'যুক্তির প্রতিমূর্তি ও বাস্তব রূপ'; কিন্তু রাষ্ট্র তেমন কিছু নয়, বরং বিকাশের বিশেষ কোনও স্তরেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। সমাজে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে মানেই সমাজ সমাধানের অতীত একটা স্ববিরোধিতার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে; ইহার অর্থ, মীমাংসার অতীত এক দ্বন্দ্বে সমাজ দীর্ণ, যে দ্বন্দ্ব নিরাকরণে সমাজ অক্ষম। বিভিন্ন শ্রেণী, যাহাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ পরস্পর বিরোধী, তাহারাই হইতেছে সমাজের এই অর্ন্তদ্বন্দ্ব; এই দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলি যাহাতে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজেদের ও গোটা সমাজকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিতে না পারে, তাহারই জন্য এমন একটি শক্তির প্রয়োজন ঘটে যাহাকে আপাতদৃষ্টিতে সমাজের উর্ধ্বে অবস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়; শ্রেণী-সংঘাতকে প্রশমিত করিয়া 'শৃঙ্খলা'র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখাই হইল যাহার উদ্দেশ্য; এই শক্তি সমাজ হইতে উদ্ভূত হইয়াও নিজেকে সমাজের উর্ধ্বে স্থাপন করে এবং ক্রমশ সমাজ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নেয়; এই শক্তি-ই হইতেছে রাষ্ট্র।"(পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, পৃ: ১৭৭-৭৮, ষষ্ঠ জার্মান সংস্করণ)

রাষ্ট্রের অর্থ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা কী, সে-সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্বের মূল ধারণা উদ্ধৃত অংশের মধ্যে বিশদভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। রাষ্ট্র হইতেছে শ্রেণী-বিরোধ সমাধানের অসম্ভবপরতার ফল ও অভিব্যক্তি। যখন যেখানে ও যে-অনুপাতে শ্রেণী- বিরোধ বাস্তবে সমাধান করিতে পারা যায় না তখন সেই অবস্থায় ও সেই অনুপাতে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। অপর দিক হইতে ইহাও বলা চলে যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব-ই প্রমাণ করে যে, শ্রেণী-বিরোধ মীমাংসার অতীত। ঠিক এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল বিষয়টির ব্যাপারেই মার্কসবাদকে বিকৃত করা হয়, বিকৃত করা হয় প্রধানত দুই দিক হইতে।

একদিকে, বুর্জোয়া তত্ত্ব-প্রবক্তারা, বিশেষভাবে খুদে-বুর্জোয়া তত্ত্ব-প্রবক্তারা, যেখানে শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী-সংগ্রাম আছে কেবল সেখানেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান, অবিসংবাদিত তথ্যের চাপে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেও তাহারা মার্কসকে এমনভাবে 'শোধন' করে যাহাতে মনে হইবে যে, রাষ্ট্র হইল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি ঘটাইবার একটি যন্ত্র বিশেষ। মার্কসের মতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি যদি সম্ভব-ই হইত, তাহা হইলে রাষ্ট্রের উদ্ভবই হইত না, রাষ্ট্র স্বকীয় অস্তিত্বই বজায় রাখিতে পারিত না। কিন্তু খুদে-বুর্জোয়া এবং পণ্ডিতমূর্খ অধ্যাপক ও প্রচারকদের মতে, রাষ্ট্রশক্তি বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি ঘটায় তাঁহারা প্রায়ই সদভিপ্রায়ে মার্কসের উক্তির দোহাই পাড়িয়া তাঁহাদের এই মত জাহির করেন! মার্কসের মতে, রাষ্ট্র হইতেছে শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে পীড়ন করিবার যন্ত্র; যে-'শৃঙ্খলা' শ্রেণীসংঘর্ষকে প্রশমিত করিয়া এই পীড়নকে বিধিবদ্ধ করে, সেই কায়েমী 'শৃঙখলা' প্রবর্তন করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু খুদে-বুর্জোয়া রাজনীতিকদের মতে শৃঙ্খলার অর্থ হইতেছে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আপস-নিষ্পত্তি, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে পীড়ন করা নয়; তাঁহাদের মতে, শ্রেণী-সংঘর্ষ প্রশমিত করার অর্থ হইতেছে নিপীড়িত শ্রেণীদের খুশি করা, উৎপীড়কদের উৎখাত করার সংগ্রামের নির্দিষ্ট উপায় ও পদ্ধতি হইতে নিপীড়িত শ্রেণীদের বঞ্চিত করা নয়।

উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৯১৭ সালের বিপ্লবে (ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে) যখন রাষ্ট্রের আসল অর্থ ও ভূমিকার প্রশ্ন একটি ব্যবহারিক প্রশ্ন হিসাবে বিরাট আকারে দেখা দেয় এবং ব্যাপক ভিত্তিতে সেই প্রশ্নের আশু মীমাংসার প্রয়োজনও দেখা দেয়, তখন সঙ্গে সঙ্গেই, সোসালিস্ট-রেভোলিউশনারি** ও মেনশেভিকরা সকলেই 'রাষ্ট্র' বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে 'আপস-নিষ্পত্তি ঘটায়", খুদে-বুর্জোয়াদের এই মতবাদের কবলে সম্পূর্ণরূপে ঢলিয়া পড়ে। এই উভয় দলের রাজনীতিকদের অসংখ্য প্রস্তাব ও প্রবন্ধ খুদে-বুর্জোয়াদের 'আপস-নিষ্পত্তি'র এই নোংরা তত্ত্বে একেবারে ভরপুর। খুদে-বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা এই কথাটি কখনও বুঝিতে পারিবে না যে, রাষ্ট্র হইতেছে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর শাসন-যন্ত্র, যে-শ্রেণী তাহার প্রতিপক্ষের (তাহার বিরুদ্ধে শ্রেণীর) সহিত আপস-নিষ্পত্তিতে আসিতে পারে না। আমাদের সোসালিষ্ট-রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকরা যে আদবেই সোসালিস্ট নয়। (আমরা বলশেভিকরা এই কথা বারবার বলিয়া আসিতেছি) সোসালিস্ট-ঘেঁষা বুলি আওড়াইতে অভ্যস্ত খুদে-বুর্জোয়া গণতন্ত্রী মাত্র, তাহার অন্যতম জাজ্বল্যমান প্রমাণ হইতেছে রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা।

অন্যদিকে 'কাউটস্কিপন্থীরা' যেভাবে মার্কসকে বিকৃত করে, তাহা আরও সূক্ষ্ম ধরনের। রাষ্ট্র হইতেছে শ্রেণীগত শাসনের যন্ত্র, এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ আপসে মীমাংসা করা যায় না – 'তত্ত্বের দিক হইতে' তাহারা একথা অস্বীকার করে না; কিন্তু যে বিষয়টি তাহারা ভুলিয়া যায় বা উপেক্ষা করে, তাহা হইল এই : মীমাংসার অতীত যে শ্রেণী-বিরোধ, তাহারই ফলে যদি রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়া থাকে, রাষ্ট্র যদি সমাজের উর্ধ্বে অবস্থিত এক শক্তি হয় যে-শক্তি 'সমাজ হইতে নিজেকে ক্রমশই বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেছে' তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, একটা সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতিরেকে নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তিলাভ সম্ভব নয়; শুধু তাহাই নয় – শাসকশ্রেণী রাষ্ট্রশক্তির যে-যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছে এবং যাহার মধ্যে এই 'বিচ্ছেদ' মূর্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই যন্ত্রের ধ্বংস ব্যতিরেকে নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তি সম্ভব নয়। আমরা পরে দেখিব যে, বিপ্লবের বিভিন্ন সমস্যা ঐতিহাসিক দিক হইতে মূর্ত রূপে বিশ্লেষণ করিয়া মার্কস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন এবং তত্ত্বের দিক হইতে এই সিদ্ধান্ত স্বতঃপ্রকট। কাউটস্কি যে ঠিক এই সিদ্ধান্ত-ই 'বিস্মৃত হইয়াছেন' ও বিকৃত করিয়াছেন, আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা তাহা বিশদভাবে দেখাইব।

... ... (চলবে) ... ...

* সোসাল-শভিনিস্ট : "যাহারা কথায় সমাজতন্ত্রী কিন্তু কাজে উগ্র জাতীয়তাবাদী, যাহারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ে 'জাতীয় দেশরক্ষা'র পক্ষপাতী। – লেনিন

** সোসালিস্ট-রেভোলিউশনারি : জারের আমলে রাশিয়ার একটি দল। কেরেনেস্কি ছিলেন এই দলের অন্যতম নেতা।

[চিরায়ত মার্কসবাদী সাহিত্য ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের অংশ হিসাবে ১৯১৭ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত কমরেড লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে। এবার রচনাটির প্রথম কিস্তি পত্রস্থ হল। বাংলা অনুবাদ নেয়া হয়েছে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে। প্রকাশ-সংক্রান্ত ত্রুটি-বিচ্যুতির দায় আমাদের।]

বর্ধিত ভূমি উন্নয়ন কর প্রত্যাহারের দাবিতে রংপুরে মানববন্ধন-সমাবেশ ও স্মারকলিপি পেশ

বর্ধিত ভূমি উন্নয়ন কর প্রত্যাহারের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট। এরই ধারাবাহিকতায় ২০ জানুয়ারি সকাল ১১টায় সংগঠনের রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে নগরীতে মানববন্ধন-সমাবেশ এবং জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়। রংপুর প্রেসক্লাব চত্বরে সংগঠনের জেলা আহবায়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পলাশ কান্তি নাগ, কৃষক প্রতিনিধি আব্দুস সাত্তার প্রামানিক, সামসুল আলম, মোহাম্মদ ইসলাম, আহসানুল আরেফিন তিতু প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সাধারণ মানুষকে প্রতিনিয়ত সাব রেজিস্ট্রি-ভূমি-সেটেলমেন্ট অফিসের অনিয়ম-হয়রানীর মুখোমুখী হতে হয়। এর পাশাপাশি বর্তমানে নতুন মাত্রা হিসেবে যুক্ত হয়েছে বর্ধিত ভূমি উন্নয়ন কর। চলতি বাংলা সন ১৪২২ হতে সরকারি নির্দেশের কথা বলে ভূমি অফিসের কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার শতক প্রতি বার্ষিক ভূমি উন্নয়ন কর বাণিজ্যিক-২৫০ টাকা, শিল্প-১৫০ টাকা, কৃষি-আবাসিক ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত-৫০ টাকা হারে আদায় শুরু করেছে। বিগতসময়ে শতক প্রতি বার্ষিক ভূমি উন্নয়ন কর আবাসিক ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত ছিল ৭ টাকা। এছাড়াও সিটি কর্পোরেশন বহির্ভূত এলাকায় শতক প্রতি বার্ষিক ভূমি উন্নয়ন কর বাণিজ্যিক-৪০ টাকা, শিল্প-৩০ টাকা, কৃষি-আবাসিক ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত-১০ টাকা হারে আদায় করছে। রংপুর কৃষি প্রধান অঞ্চল। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রায় ৯০ ভাগ কৃষি জমি। এখানকার মানুষের জীবন-জীবিকা প্রধানত কৃষির সাথে সম্পর্কিত। প্রতিনিয়ত উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে, কিন্তু কৃষক ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। ক্ষেতমজুর-দিনমজুরদের সারা বছরের কাজের নিশ্চয়তা নেই। রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গরিব মানুষদের জন্য টিআর-কাবিখা, কর্মসৃজনসহ সকল প্রকার সরকারি সহায়তা বন্ধ করা হয়েছে। এমনি পরিস্থিতিতে বর্ধিত ভূমি উন্নয়ন কর এই মানুষদের জীবনে গোদের উপর বিষ-ফোঁড়া'র শামিল।

নেতৃবৃন্দ বর্ধিত ভূমি উন্নয়ন কর প্রত্যাহার, কৃষি জমির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন, পৌরসভা বা সিটির ব্যবধান রহিতকরণ, ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির উন্নয়ন কর মওকুফের সরকারি ঘোষণা বাস্তবায়ন, সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পর্যাপ্ত টিআর-কাবিখা, কর্মসৃজন প্রকল্প চালুর জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান। সমাবেশের পর জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

এ দাবিতে গত ১৮ জানুয়ারি সন্ধ্যায় রংপুর নগরীর গোলাগঞ্জ ও মরিচটারী বাজারে ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে পৃথক দুটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। একই দাবিতে গত ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি নগরীর আমাশু কুকরুল, রঘু বাজার, খলিশাকুরীতে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধিত ভূমি উন্নয়ন কর প্রত্যাহার ও ধানের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার দাবিতে ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের উদ্যোগে ২০ ডিসেম্বর বেলা ১২টায় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর মর্যাদা এদেশ কখনোই দিতে পারেনি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) বড় মানুষ ছিলেন। এ নাহলে তারা এভাবে চুপ করে থাকতেন না। বুদ্ধিজীবী এদেশে আছেন ঠিকই কিন্তু এতবড় মানুষকে বুঝতে পারার জন্য যে জ্ঞান দরকার, মানবিকতা ও মূল্যবোধ দরকার তার চিহ্নমাত্র এদেশে নেই। আমরা অনেক বুদ্ধিমান মানুষ বটে, তবে অনেক ক্ষুদ্র, নীচ মনের মানুষ আমরা। সেজন্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে বুঝতে পারিনি। বুঝতে যে পারিনি সেটা বুদ্ধির অভাবের জন্য নয়, মূল্যবোধের অভাবের জন্য। মূল্যবোধ আর বুদ্ধি এক জিনিস নয়। তাই তাঁর মূল্যও এদেশ দিতে পারেনি। ভারতও দিতে পারেনি। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর শিষ্য ভারতরত্ন হয়েছেন। কিন্ত যিনি গুরু, সমগ্র ভারতবর্ষের যন্ত্র সঙ্গীতের গুরু, অতুলনীয় সংগীতজ্ঞ – ভারতেও তাঁর যোগ্য সম্মান তিনি পাননি। সত্যিকারের যত বড় সম্মান ভারত দিতে পারে, সে সম্মান তারা তাঁকে দেয়নি। আর বাংলাদেশ তো তাঁকে চিনতেই পারেনি। চিনতে পারার কোনো সাধনাই বাংলাদেশে নেই। একটি শিল্পকে বোঝতে পারার জন্য যে রসের পরিবেশ থাকা দরকার বাংলাদেশ তার ধারে কাছেও নেই। তাই বোঝার লোক এদেশে খুব একটা নেই। না বোঝার জন্য তাঁর স্মৃতির উপর এই কাণ্ডটা হয়ে গেল।

এ উপমহাদেশের রাজনীতির অনেক বড় বড় মানুষ বাংলাদেশে জন্মেছেন। কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রে এতবড় মানুষ আলাউদ্দিন খাঁর সম্প্রদায় জন্ম দিতে পারেনি। বিদ্যাসাগর যত বড় মানুষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যত বড় মানুষ – শিল্পজগতে আলাউদ্দিন খাঁ তাঁদের সমকক্ষ মানুষ। তাঁর ঋণ শোধ করার ক্ষমতা বাংলাদেশের নেই। এত বড় মানুষকে বাঙালি তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বুঝতে পারে না, চিনে না, জানে না। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেদের এ ধরনের কোন মানুষ জন্ম দেয়ার বাস্তবতা এখন এদেশে নেই। তাঁর অসম্মানে কষ্ট হবে কেন? বুঝতে পারলে তো কষ্ট? বুঝতে পারলে যে কষ্ট, সে কষ্টবোধের মানুষও নেই। আছেন যে, তাঁর কোনো পরিচয়ও এদেশে কেউ দেখাতে পারেননি। প্রতি বছর ঢাকায় ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের কনসার্টে হাজার হাজার লোক হয়। কিন্তু সে রকম প্রতিবাদ হলো কই? এক হাজার লোকেরও তো একটি প্রতিবাদ হলো না।

ভারতের সঙ্গীতাঙ্গনে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে এ ঘটনায়। আলাউদ্দিন খাঁর মেয়ে অন্নপূর্ণার ছাত্র পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া বলেছেন, "এটা মানবতার মৃত্যু।" পণ্ডিত যশরাজ বলেছেন, "বাংলাদেশের মানুষ সঙ্গীত এতো ভালবাসে, সেখানে এ ঘটনা কিভাবে ঘটলো?" ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর নাতি, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর পুত্র ওস্তাদ আশীষ খাঁ বলেছেন, "বাংলাদেশ কখনই দাদুকে যোগ্য সম্মান দেয়নি। খুবই মর্মাহত বোধ করছি।" প্রতিবাদ করেছেন ওস্তাদ রশীদ খাঁন, পণ্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদারসহ আরও অনেকে।

আমরা চাই, এ ঘটনায় গভীর মর্মবেদনা সৃষ্টি হোক। এখনও প্রতিবাদের সময় আছে, লেখার সময় আছে। যারা শিক্ষিত, যারা সংস্কৃতির চর্চা করেন তারা নামুন। সরকারের ভাড়াখাটা বুদ্ধিজীবীদের কথা বলছি না। যারা স্বতন্ত্র, স্বাধীন চিন্তা করেন, তাঁদের কথা বলছি। আপনারা কেউই কেন প্রতিবাদ করতে পারলেন না ভেবে দেখুন। আসলে আপনাদের চিন্তায় তিনি কত বড় মানুষ এটা ধরতে না পারার অভাবের জন্য এই কাণ্ডটি হয়েছে।

অনেক লড়াই করে দেশের স্বাধীনতা আমরা এনেছি। গোলামী কেন সহ্য করিনি? স্বাধীন কেন হলাম? বড় মানুষ হওয়ার জন্য তো? বড় মানুষকে বুঝতে না পেরে, তাঁর মর্যাদা রক্ষা না করে কি নিজে বড় হওয়া যায়? আমরা আহবান জানাচ্ছি, দেশের শিক্ষিত-সচেতন মানুষরা এই জঘন্য কাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।

ভোটারবিহীন নির্বাচনের দুই বছর পূর্তিতে বাম মোর্চা

ভোটাধিকারসহ গণতান্ত্রিক অধিকার সংকুচিত করে স্বৈরতান্ত্রিক নিপীড়নমূলক শাসন জোরদার করা হয়েছে

৫ জানুয়ারি ২০১৪-এর ভোটারবিহীন নির্বাচনের দুই বছর পূর্তি এবং সদ্যসমাপ্ত পৌরসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার বক্তব্য তুলে ধরতে এক সংবাদ সম্মেলন ৪ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১১টায় ২৩/২ তোপখানা রোডস্থ কমরেড নির্মল সেন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী অধ্যাপক আবদুস সাত্তার। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ সদস্য সাইফুল হক, আবদুস সালাম, মোশরেফা মিশু, হামিদুল হক, ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, ৫ জানুয়ারি '১৪ সালের ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত মহাজোট সরকারের দুই বছরে গণতান্ত্রিক অধিকারকে ক্রমাগত সংকুচিত করে দেশে এক স্বৈরতান্ত্রিক নিপীড়নমূলক শাসন কায়েম করা হয়েছে। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন এবং গতবছর ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ধারাবাহিকতায় সদ্যসমাপ্ত পৌরসভা নির্বাচনে প্রশাসনিক কারসাজি, বলপ্রয়োগ ও জালিয়াতির মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকারকে আরেকবার পদদলিত করা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে দীর্ঘস্থায়ী ফ্যাসিবাদী শাসনের বিপদ ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছে। মহাজোট সরকার জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও সভা-সমাবেশের গণতান্ত্রিক অধিকারকেও নানাভাবে হরণ করে চলেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড-গুম-নির্যাতন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। বিচারব্যবস্থাসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, গণমাধ্যমসহ সোশ্যাল মিডিয়াকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

তারা বলেন, মহাজোট সরকার উন্নয়নের কথা বলে গণতন্ত্রকে বনবাসে পাঠিয়েছে। অথচ সীমাহীন দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, ব্যাংক লুট, অর্থ পাচার, দলীয়করণ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি অতীতের বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের মত বর্তমান সরকারেরও বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। উন্নয়নের নামে মহাজোট সরকার বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবনের পাশে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো পরিবেশবিধ্বংসী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ভারতের সাথে যৌথভাবে। রাশিয়ার ঋণ ও প্রযুক্তিতে বিপুল ব্যয়ে রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে যা ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল' স্থাপন করতে হবিগঞ্জে চা-বাগানে বংশপরম্পরায় বসবাসরত হতদরিদ্র চা-শ্রমিকদের তাদের কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এই অগণতান্ত্রিক ও গণবিরোধী শাসনের সুযোগে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী-মৌলবাদী তৎপরতার জমিন বিস্তৃত হচ্ছে। অতীতের বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের মতো বর্তমান মহাজোট সরকারের কাছেও দেশ-জনগণের গণতান্ত্রিক কোনো ভবিষ্যত নেই। এই অবস্থায় ভোটাধিকারসহ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করা, জাতীয় সম্পদ রক্ষাসহ জনজীবনের সংকট নিরসনের দাবিতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামে সংগঠিত হতে গণতন্ত্রমনা জনসাধারণের প্রতি আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

বর্ষবরণে যৌননিপীড়নসহ নারী-শিশু নির্যাতনকারীদের গ্রেফতার ও বিচার, নারী নির্যাতন বন্ধসহ ৫ দফা দাবিতে

দেশব্যাপী নারীমুক্তি কেন্দ্রের বিক্ষোভ

বর্ষবরণে যৌন নিপীড়নসহ নারী-শিশু নির্যাতনকারীদের গ্রেফতার ও বিচার; অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা, মাদক-জুয়া, পর্নোপত্রিকা, ব্লু-ফিল্ম, ইন্টারনেটে পর্নো ওয়েবসাইট বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিসহ ৫ দফা দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ৯ জানুয়ারি দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তারই অংশ হিসেবে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দুপুর ১২টায় মানবন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নারীমুক্তি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সীমা দত্ত, সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন ও অর্থ সম্পাদক তাছলিমা আক্তার বিউটি।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ২০১৪ সাল থেকে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে জেলায় জেলায় স্বাক্ষরসংগ্রহ ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান, অশ্লীল পোষ্টারে কালি লেপন, পথসভা-হাটসভা, বিক্ষোভ সমাবেশ, ডিসি অফিস-পুলিশ সুপারের কার্যালয় ঘেরাও, নারী সমাবেশ, মতবিনিময় সভা ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করেছে। তারই ধারাবাহিকতায় আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি ৫ দফা দাবিসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হবে। দাবিগুলো হল – বর্ষবরণে যৌন নিপীড়নসহ সারা দেশে নারী-শিশু নির্যাতনকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান; সর্বত্র নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধ করতে হবে। হাইকোর্ট প্রণীত যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা কার্যকর করতে হবে। অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা বন্ধ করতে হবে। পর্নো পত্রিকা, ব্লু-ফিল্ম, ইন্টারনেটে পর্নো ওয়েবসাইট বন্ধ করতে হবে। নাটক-সিনেমা-বিজ্ঞাপনে নারী দেহের অশ্লীল উপস্থাপনা বন্ধ করতে হবে। মাদক ও জুয়া বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতা, ফতোয়াবাজি এবং ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা-কুসংস্কার বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইউনিফরম সিভিল কোড চালু করতে হবে। সিডও সনদের পূর্ণ স্বীকৃতি ও বাস্তবায়ন করতে হবে। নারীশিক্ষাকে বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ করতে হবে। নারীর স্বাবলম্বীতার জন্য নারী শিক্ষাকে অর্থবহ করে তুলতে হবে। গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া নারী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের জন্য খেলাধুলা ও আত্মরক্ষামূলক শরীরচর্চা আবশ্যিক করতে হবে। নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত হোস্টেল নির্মাণ করতে হবে।

রংপুর : ৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১১টায় নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ ও পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। স্থানীয় প্রেসক্লাব চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল নগরীর প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের সামনে সমবেত হয়। সেখানে ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান কর্মসূচি চলাকালে সমাবেশে বক্তৃতা করেন নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলা সংগঠক নন্দিনী দাস, রীনা আক্তার প্রমুখ। এছাড়াও সংহতি জানিয়ে বক্তৃতা করেন বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ, আহসানুল আরেফিন তিতু।

গাইবান্ধা : নারীমুক্তি কেন্দ্র গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ৯ জানুয়ারী দুপুর ১২টায় মানবন্ধন এবং পরে জেলা পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। অধ্যাপক রোকেয়া খাতুনের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন নাগরিক পরিষদ গাইবান্ধা জেলার আহবায়ক এড. সিরাজুল ইসলাম বাবু, নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, পারুল বেগম, শামীম আরা মিনা।

৯ ডিসেম্বর রোকেয়া দিবসে দিনাজপুরে নারীমুক্তির বিক্ষোভ

স্কুলে স্কুলে বেতন ও ভর্তি ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সংগ্রহ, মতামত সংগ্রহ, বিশিষ্টজনদের বিবৃতি প্রদান, পথসভা, মেয়রকে স্মারকলিপি প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী জনস্বার্থ বিরোধী কথার হেরফের করে না। তাই জনগণের কোনো মতামতকে তোয়াক্কা না করে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন ধ্বংসের মুখে ফেলে ৬ ডিসেম্বর '১৫ তারিখে চসিকের প্রথম সাধারণ সভায় ভর্তি ফি ও বেতন শতভাগ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্বাধীনতার পরবর্তিতে চট্টগ্রামে কোনো সরকারি মাধ্যমিক স্কুল নির্মিত হয়নি। বিশাল সংখ্যার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৯টি সরকারি স্কুল আছে। উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ আছে মাত্র ৬টি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে চসিকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায় ৯০ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করে। এই বর্ধিত ফি বাতিল না হলে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে চট্টগ্রামের ৩২ জন বিশিষ্ট নাগরিক বিবৃতি প্রদান করেন। আইনজীবী, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ প্রায় ১০ সহস্রাধিক মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে শতশত শিক্ষার্থী অভিভাবকবৃন্দসহ মেয়র বরাবর দুই দুই বার স্মারকলিপি পেশ করা হয়। গত ৬ জানুয়ারি স্মারকলিপি পেশকালে আন্দরকিল্লার ব্যস্ততম সড়ক দু'ঘণ্টার জন্য অবরোধ করা হয়। প্রতিটি সংবাদপত্রে এ আন্দোলন কর্মসূচিগুলো গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়েছে। আন্দোলনের পক্ষে সংবাদপত্রে বিশেষ প্রতিবেদন, কলাম এবং চট্টগ্রামের ৩২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিবৃতিসহ অভিভাবকদের চিঠি প্রকাশ করা হয়। গণমানুষের মতামত বেতন-ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে হলেও এবং শিক্ষার্থী অভিবাবকরা টানা কর্মসূচি পালন করলেও মেয়র তার অবস্থানে অনড়। এই দাবিতে পাড়ায় পাড়ায় শিক্ষার্থী অভিভাবকদের নিয়ে গণ কমিটি তৈরির ভিত্তিতে বর্তমানে 'চসিক পরিচালিত শিক্ষার্থী অভিভাবকবৃন্দে'র ব্যানারে আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। গত ১০ জানুয়ারি এই ব্যানারে মেয়র বরাবর স্মারকলিপি পেশ কর্মসূচিতে মেয়র অভিভাবকদের সাথে আলোচনায় না এসে অগণতান্ত্রিক, ফ্যাসিস্ট কায়দায় পুলিশ দিয়ে হামলা চালায়। অভিভাবকরা সেদিন ভয়ভীতি উপেক্ষা করে তাদের প্রাণের দাবিতে আরো সংগঠিত হয়।

১২ জানুয়ারি সংহতি সমাবেশ এবং ১৯ জানুয়ারি অভিভাবক শিক্ষার্থীরা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাবেন বলে ঘোষণা করেন।

সারাদেশের বেসরকারি স্কুলে বিশেষত ঢাকা ও চট্টগ্রামের স্কুলগুলোতে অস্বাভাবিক হারে বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুল, উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল, মিরপুরের শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বিয়াম স্কুল, সেন্ট যোসেফ স্কুলে ৫০ থেকে ১০০ ভাগ বেতন বাড়ানো হয়েছে। উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলে শ্রেণিভেদে কমপক্ষে ৮০০ থেকে ১ হাজার টাকা বেতন বাড়ানো হয়েছে। প্রিপারেটরিতে ভর্তি ফি এ বছর দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকার বদলে আদায় করা হচ্ছে ১০ হাজার টাকা। মিরপুরের শহীদ পুলিশ স্কুলে বেতন বেড়েছে ৪ হাজার ৭৬৫ টাকা।

এই অস্বাভাবিক বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১৭ জানুয়ারি দুপুর ১২টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিছিলটি পুরাতন ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে শুরু হয়ে কলেজিয়েট স্কুল, লক্ষীবাজার ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়। করেন সংগঠনের ঢাকা নগর শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাঈমা খালেদ মনিকার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা মলয় সরকার, রাশেদ শাহরিয়ার, ইভা মজুমদার, মেহরাব আজাদ। পরে একটি প্রতিনিধি দল জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে।

সভাপতির বক্তব্যে নাঈমা খালেদ মনিকা বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালায় বলা আছে, ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ, উন্নয়ন ফিসহ বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা এবং ইংরেজি মাধ্যমে (ভার্সন) সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নেয়া যাবে। অথচ বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই বেতন বাড়িয়েছে ৪০ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত। ইতোমধ্যেই উচ্চ আদালতের রায়ে সরকারি ভর্তি নীতিমালার বাইরে ফি গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই নীতিমালা মেনে চলবে এবং শিক্ষা মন্ত্রলালয় এই ফি গ্রহণের ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণ করবে বলেও এই আদেশে বলা হয়েছে। অথচ কোনো দিক থেকেই এই নিয়মের তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। যেসব স্কুল বেতন বাড়িয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এখনও কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। শিক্ষাকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করার এই অশুভ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসকের প্রতি আহ্বান জানান। একইদিন বিকাল ৪টায় মিরপুর সাড়ে ১১ নম্বরে রংধনু মার্কেটের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি পালিত হয়।

কিশোরগঞ্জে শীতবস্ত্র বিতরণ

বাসদ (মার্কসবাদী) কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে ১ জানুয়ারি '১৬ গোবিন্দপুর ইউনিয়নে দরিদ্র মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। দলের উদ্যোগে এলাকার মানুষের কাছ থেকে গণচাঁদা সংগ্রহ করেই এই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

এতে উপস্থিত ছিলেন দলের ময়মনসিংহ জেলা শাখার সমন্বয়ক শেখর রায়, কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সংগঠক আলাল মিয়া, গোবিন্দপুর ইউনিয়নের সংগঠক জমির ব্যাপারী, সোহরাব মিয়া, জেলা ছাত্র ফ্রন্ট নেতা ফাহমিদ আহমেদ প্রমুখ।

শিক্ষকদের স্বতন্ত্র পে-স্কেলের আন্দোলনে ছাত্র ফ্রন্টের সংহতি

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্বতন্ত্র পে-স্কেল ও গ্রেড বৈষম্য নিরসনের দাবিতে চলমান আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১২ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল ও সমাবেশ করা হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা মলয় সরকার, রাশেদ শাহ-রিয়ার, মাসুদ রানা ও ইভা মজুমদার। বক্তারা বলেন, শিক্ষক সমাজ হচ্ছেন জাতি গড়ার কারিগর। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনেই শিক্ষকদের সর্বোচ্চ বেতনকাঠামো হওয়া উচিত। কিন্তু সরকার যে নতুন বেতনকাঠামো ঘোষণা করেছে তাতে শিক্ষকদের মানের অবনমন ঘটানো হয়েছে। শিক্ষকরা পে-স্কেল ঘোষণার পর দীর্ঘ সময় ধরে তাদের সম্পূর্ণ যৌক্তিক দাবিতে আন্দোলন করলেও প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা পর্যন্ত শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে অসম্মানজনক ও আপত্তিকর বক্তব্য দিচ্ছেন। বক্তারা অবিলম্বে শিক্ষকদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। একইসাথে শিক্ষকদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর বাণিজিকীকরণসহ নানামুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানান।

মাস্টারদা সূর্যসেন

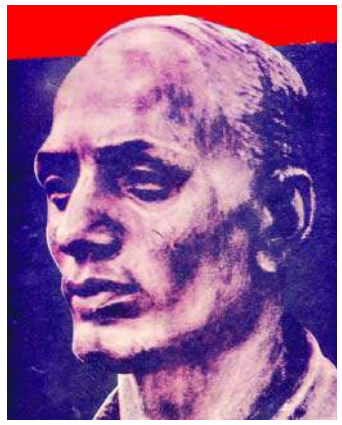

"তোমাদের বিদ্যার্জন, তোমাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণ, তোমাদের ভাবী জীবনের স্বপ্ন ও চিন্তার মধ্যে সবকিছুর ঊর্ধ্বে মনে একটি কথাকে কি প্রোজ্জ্বল করে রাখতে পারবে – পরাধীনতার অভিশাপ থেকে, ইংরেজের পরাধীনতার পীড়ন থেকে এই দেশকে মুক্ত করাই তোমাদের ব্রত – আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য?"

"রেখে যাবার মতো একটি জিনিসই আমার আছে; তা হল আমার স্বপ্ন। সারাজীবন প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে জগতের আর সবকিছু ভুলে ক্লান্তিহীন আমি ছুটে চলেছি। জানি না আরাধ্য কাজ সফল করার পথে কতটা এগিয়ে যেতে পারলাম। জানি না সেই পথের কোনখানে এসে আমাকে থেমে যেতে বাধ্য করা হল। যদি লক্ষ্যে পৌঁছাবার আগে মৃত্যুর শীতল হাত তোমাকেও স্পর্শ করে তবে আরাধ্য কাজের দায়িত্ব তোমার উত্তরসূরীদের হাতে অর্পণ করো। যেমন আমি এগিয়ে গেলাম। এগিয়ে চলো, সামনে এগিয়ে চলো, পিছিয়ে পড়ো না, মুহূর্তের জন্যও না।"

[গত ১২ জানুয়ারি ছিল বিপ্লবী মাস্টার দা সূর্যসেনের ৮২তম ফাঁসি দিবস]

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

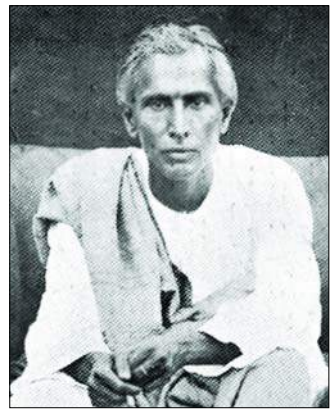

"... সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কতো দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে।"

[গত ১৬ জানুয়ারি ছিল মহান কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের ৭৮তম মৃত্যুবার্ষিকী]

রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের দাবি
ফ্রান্সে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ

সুন্দরবনের পাশে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প বাতিলের দাবিতে ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কেন্দ্রের সামনে বাসদ (মার্কসবাদী) সমর্থক ফোরাম ফ্রান্স শাখা ও সিপিবি ফ্রান্স শাখার উদ্যোগে ১ জানুয়ারি মানববন্ধন এবং সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে
প্রাইভেট গাড়ি চালক ইউনিয়নের সমাবেশ

গত ১১ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় প্রাইভেট গাড়ি চালক ইউনিয়নের উদ্যোগে ড্রাইভারদের সর্বনিম্ন বেতন ১৬ হাজার টাকা, ৮ ঘণ্টার বেশি কাজে ওভারটাইম, নিয়োগপত্র, সাপ্তাহিক ছুটি, বেতন-বোনাস, বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি, পুলিশি হয়রানী বন্ধ, দুর্ঘটনা কবলিত ড্রাইভারদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

রেল : ভাড়া বৃদ্ধি কেন?

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) সরকার ভর্তুকি দিতে পারতো না? সবকিছুর দাম বাড়ছে ফলে রেলের ভাড়াও বাড়াতে হবে – এ যুক্তিতে রেলের ভাড়াবৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে স্বল্প আয়ের মানুষ বাঁচবে কীভাবে? পরিবেশ, অর্থনীতি, জনসেবা, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, করপ্রদান, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে রেলওয়ের অর্থনৈতিক অবদান বিবেচনা করলে দেখা যাবে, রেল কখনোই অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল না। কর প্রদানের বিনিময়ে জনগণ রাষ্ট্রের কাছ থেকে সেবা পাওয়ার কথা। রেলে বরাদ্দ জনগণকে সেবা প্রদানের জন্য ও দেশের উন্নয়নে এক ধরনের বিনিয়োগ। রেলওয়ে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই রেল ভর্তুকি দিয়ে চলে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। জনগণের করের টাকায় এই গণপরিবহন খাতটি পরিচালিত হয়। পরিবেশবান্ধব, সস্তা, আরামদায়ক, নিরাপদ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী হিসেবে সড়কের তুলনায় রেলব্যবস্থার বিস্তৃতি ও জনপ্রিয়তা বাড়ছে। অথচ বাংলাদেশ রেলওয়ে উল্টোপথে হাঁটছে। চাহিদা ও সম্ভাবনা থাকলেও একসময়ের লাভজনক রেলখাত গত ৪৩ বছরে কেন সংকুচিত ও লোকসানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো?

রেলখাত : পরিকল্পিত অবহেলার শিকার

সারাবিশ্বে রেলপথের বিস্তৃতি ঘটলেও আমাদের দেশে রেলখাতকে চরম অবহেলা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পর গত ৪৩ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হলেও বাড়েনি রেলপথ। ১৯৪০ সালে রেলপথ ছিল ২৮৫৮ কি.মি., বর্তমানে তা ২৮৩৫ কি.মি.। অন্যদিকে ব্যয়বহুল সড়ক যোগাযোগকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ সড়ক যোগাযোগের তুলনায় রেলে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সাশ্রয়ী ও নিরাপদ। ১টি মালবাহী ট্রেন ২১০টি পাঁচটনি ট্রাকের সমান মালামাল পরিবহনে সক্ষম। রেলের দক্ষ জনবল গড়ে তোলার বদলে একের পর এক শ্রমিক ও দক্ষ কারিগর ছাঁটাই করা হয়েছে। '৭০ সালে রেলের জনবল ছিল ৬৫,২৪৫ জন, এখন তা কমে হয়েছে ২৫,৯৮৭ জন। জনবল হ্রাসের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১৬৪টি স্টেশন। রেলের আধুনিকায়নে নেয়া হয়নি কার্যকর কোনো উদ্যোগ। ইঞ্জিন, কোচ, রেললাইনের জরাজীর্ণ অবস্থার কারণে বেড়েছে রেল দুর্ঘটনা, বাড়ছে সিডিউল বিপর্যয়। এই কারণে '৯টার ট্রেন কয়টায় আসে' – কথাটা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে। রেলের ২৯৩টি ইঞ্জিনের মধ্যে ১৮৪টিরই আয়ুষ্কাল ইতোমধ্যে শেষ। আর বর্তমানে ৯২০০টি বগির মধ্যে ৮৮৭৬টিরই মেয়াদ শেষ। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কোচের অভাবে যাত্রী পরিবহন করতে পারছে না রেল। ট্রেন চালানোর মতো পর্যাপ্ত চালক নেই। নোংরা টয়লেট, অপরিচ্ছন্ন বসার আসন ও কোচ, ছারপোকা ও মশার উৎপাত, ভাঙ্গা দরজা-জানালা, টিকেট নিয়ে কালোবাজারি ও হয়রানি – সব মিলিয়ে যাত্রীসেবার মান ক্রমাগত নিম্নমুখী। প্রশ্ন হলো রেলের প্রতি এই অবহেলার কারণ কি? কেন সম্ভাবনাময় রেলখাতকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হলো?

এডিবি-বিশ্বব্যাংকসহ দাতা সংস্থার বেসরকারিকরণের প্রেসক্রিপশানই রেলের সংকটের জন্য দায়ী

রেলের এই দুর্দশা ও লোকসান কৃত্রিম। গত ৪৫ বছরে ক্ষমতাসীন দলগুলোর সদিচ্ছার অভাব, দুর্নীতি-লুটপাট, বিশ্বব্যাংক-এডিবিসহ দাতা সংস্থাগুলোর প্রেসক্রিপশনে বেসরকারিকরণ নীতিই এর জন্য দায়ী। আশির দশক হতেই শুরু হয় রেলের উপর ঋণদাতা এডিবি-বিশ্বব্যাংকের হস্তক্ষেপ। ১৯৮২ সালের পর ৫ সদস্য বিশিষ্ট রেলওয়ে বোর্ডকে ভেঙে রেলকে পূর্ব ও পশ্চিম দুটি জোনে ভাগ করে, মাথাভারী প্রশাসন সৃষ্টি করে রেলের ব্যয় দ্বিগুণ করা হয়। ব্রিটিশ আমলে যেখানে একজন জিএম চট্টগ্রামে বসে সফলভাবে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে পরিচালনা করতো, সেখানে প্রায় এক ডজন জিএম সমতুল্য পদ সৃষ্টি করা হয়। অন্যদিকে ব্যয় সংকোচনের নামে এডিবি-র ঋণের শর্ত হিসেবে ২৩০০০ দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর ছাঁটাই করা হয়। রেলের সব কারখানায় কাঁচামাল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। নানা অপচয়মূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৯১, ৯৪ ও ২০০২ সালে রেলওয়ের পুনর্গঠন, কাঠামোগত সংস্কার, বাজারমুখী করা, কর্পোরেশনে পরিণত করা – এডিবি-বিশ্বব্যাংকের এসব প্রেসক্রিপশন বাস্তবায়নের শর্তে প্রদত্ত ঋণের অর্থে রেলকে সংকুচিত ও বেসরকারিকরণের চক্রান্ত অব্যাহত থাকে। এর ফলাফল হলো ইতোমধ্যে ১৬০টি স্টেশন, নয়টি শাখা লাইন বন্ধ, ৬৫টি মেইল ও লোকাল ট্রেন বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ঋণের অর্থ নানা অপচয়মূলক প্রকল্পে খরচ করা হলেও রেলের উন্নয়নে সে অর্থ ব্যয় করা হয়নি। ১৮৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত সৈয়দপুর রেল কারখানার কোচ ও ওয়াগন তৈরির ক্ষমতা থাকলেও আজ পর্যন্ত তার আধুনিকায়ন করা হয়নি, সেখানে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ না দিয়ে বিদেশ থেকে চড়া দামে কোচ আমদানি করা হয়েছে। এ কারখানায় একটি কোচ তৈরীতে খরচ হয় মাত্র ৮০ লাখ টাকা, বিপরীতে ১টি কোচ আমদানিতে খরচ হয় ৪ কোটি টাকার বেশি। পার্বতীপুরে ইঞ্জিন তৈরির কারখানা থাকলেও আজ পর্যন্ত সেখানে ইঞ্জিন তৈরির কোনো উদ্যোগ সরকার নেয়নি। সুনামগঞ্জের ছাতকে কংক্রিট স্লিপার ফ্যাক্টরীতে প্রতিদিন ১৬০০টি স্লিপার তৈরির ক্ষমতা থাকলেও স্লিপার বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। দাতা সংস্থাগুলো স্টেশন রি-মডেলিং এর জন্য ঋণ দেয়, কিন্তু রেলের কারখানার উন্নয়নে ঋণ দেয় না।

রেলের মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে সংকট কাটবে কি?

বর্তমান মহাজোট সরকার পৃথক রেল মন্ত্রণালয় করেছে। এই সময়ের মধ্যে দেশবাসী এ মন্ত্রণালয়ের চারজন মন্ত্রীর গালভরা বুলি শুনেছে। সাবেক রেলমন্ত্রী 'লোকসানের কালো বিড়াল' খুঁজে বের করার ঘোষণার পর নিজেই দুর্নীতির কারণে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। মন্ত্রী এবং রেল কর্মকর্তারা কথায় কথায় রেলের উন্নয়ন ও রেলকে ঢেলে সাজানোর ঘোষণা দিচ্ছেন। একই সাথে চলছে ব্যাপক দুর্নীতি-লুটপাট। ২০১৩ সালে চীন থেকে আমাদের দেশের জন্য অনুপযোগী ২০ সেট ডেমু ট্রেন আমদানি করে ৬৬৪ কোটি টাকা লোকসান দেয়া সত্ত্বেও সম্প্রতি আবারও ২০২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০ সেট ডেমু আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সরকার সম্প্রতি ২০ বছর মেয়াদী একটি রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করেছে। সেখানে ২৩৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৪৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এই মাস্টার প্ল্যানের মধ্যে নতুন রেললাইন নির্মাণ, ইঞ্জিন ও বগি সংগ্রহ, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রেল নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি, কয়েকটি জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করা ইত্যাদি। এই মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে বড় অংকের ঋণ দেবে এডিবি। ঋণের শর্ত হলো প্রতিবছর রেলের ভাড়া বাড়ানো, রেলকে বাণিজ্যমুখী করা ইত্যাদি।

এই মাস্টারপ্ল্যানের ৩৮ হাজার কোটি টাকার বেশ কিছু প্রকল্পে ব্যয়ও হয়েছে। স্টেশনগুলো রি-মডেলিং যার অন্যতম। মাস্টার প্ল্যানের লক্ষকোটি টাকা থেকে সৈয়দপুর রেল কারখানার আধুনিকায়নে ১২২ কোটি ২২ লক্ষ টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেও বাস্তবায়ন করা হয়নি। নতুন নতুন রুট তৈরি হচ্ছে এটা নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়। কিন্তু পুরোনো রুটগুলোতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় ইঞ্জিন, বগি, ওয়াগন সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না, সেখানে নতুন রুট করা মানে এ রুটের জন্য ইঞ্জিন, বগি আমদানি করা হবে। ইতোমধ্যে এডিবির ঋণ নিয়ে ভারত ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ২৭০টি বগি কেনা হয়েছে। অথচ সৈয়দপুর রেল কারখানাতেই কম খরচে তা নির্মাণ করা যেত। ইতোমধ্যে খরচ হয়ে যাওয়া ৩৮ হাজার কোটি টাকার মধ্যে রেলওয়ের তিনটি কারখানাতে এক হাজার করে তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা গেলে তা দিয়ে প্রয়োজনীয় জনবল, কাঁচামাল ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ পূর্বক বিপুল সংখ্যক ইঞ্জিন, কোচ, ওয়াগন মেরামতের পাশাপাশি বিদেশি রপ্তানি করা সম্ভব। ফলে দাতা সংস্থার প্রেসক্রিপশনে রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন রেলের লোকসানের বোঝা আরো বাড়াবে।

রেলের শ্রমিক কর্মচারীদের অধিকার কেড়ে নেয়া হবে

২২ বছর পর আবার রেলে জনবল ছাঁটাইয়ের চাপ দিচ্ছে এডিবি। এর পূর্বে ১৯৯২ সালে বিশ্বব্যাংক ও এডিবির চাপে গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিককে চাকরি থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছিল। এবার এডিবি ঋণের শর্ত হিসেবে পদ ছাঁটাই করে প্রয়োজনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের জন্য চাপ দিচ্ছে। রেলওয়ে বর্তমানে ১০টি স্কুল, ১০টি হাসপাতাল, ১টি বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, ৩২টি ঔষধের দোকান সরাসরি পরিচালনা করে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালে রেলওয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাশাপাশি জনগণও সেবা পায়। অথচ এডিবি ঋণের শর্ত হিসেবে এসব স্কুল ও হাসপাতালকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে।

রেলের ভাড়া বাড়ানো ও দাতাদের প্রেসক্রিপশন ছাড়াই রেলকে লাভজনক করা সম্ভব

দাতা সংস্থার প্রেসক্রিপশন ছাড়াই প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে রেলকে লাভজনক করা সম্ভব। এর প্রমাণ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত। প্রায় ১৪ লক্ষ কর্মী ও ১১ লক্ষ পেনশনভোগী নিয়ে বিশাল ভারতীয় রেল যথাযথ পরিকল্পনা ও অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে লোকসানি প্রতিষ্ঠান থেকে আজ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের মতো ভারতের ক্ষেত্রেও বিশ্বব্যাংক আইএমএফসহ দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা বেসরকারিকরণ-যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি-লোকবল ছাঁটাইয়ের বহুল প্রচলিত প্রেসক্রিপশন দেয়। কিন্তু তা অনুসরণ না করে ভারত সরকার উল্টো সরকারি বিনিয়োগে রেলের ইঞ্জিন-চাকা-বগি তৈরির কারখানা স্থাপন করে, যাত্রীভাড়া হ্রাস করে, হাজার হাজার কর্মী নিয়োগ দেয়, ২০০৫-'০৮ সাল এ তিন বছরে নতুন দেড় হাজার যাত্রী-বাহী ট্রেন চালু করে। যার ফলে অতীতের-লোকসানি ভারতীয় রেল আজ লাভজনক প্রতিষ্ঠান। বর্তমান মহাজোট সরকার কথায় কথায় ভারতের বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত টেনে আনে, অথচ ভারতীয় রেলের উন্নয়নের মডেল দৃষ্টান্ত হিসেবে অনুসরণ করে না কেন? মাথাভারী প্রশাসন কমানো, দক্ষ কর্মচারী ও কারিগর নিয়োগ, রেল কারখানার আধুনিকায়ন, দাতা সংস্থার অপচয়মূলক প্রকল্প বাদ দেয়া হলে কোটি কোটি টাকা অপচয় কমবে। ২৩ মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কাছে রেলের বকেয়া পাওনা ১২,৬১০ কোটি টাকা। রেলের ১২,১০০ একর জমি অবৈধ দখলদারদের হাতে। এ বকেয়া পাওনা ও দখলকৃত জমি উদ্ধার করে রেলের উন্নয়নে ব্যয় করলে, রেল কর্মকর্তা-মন্ত্রী-আমলাদের দুর্নীতি-লুটপাট রোধ করতে পারলে, দাতাসংস্থার কাছে হাত পাতার দরকার নেই, যাত্রি ভাড়া বৃদ্ধিরও প্রয়োজন নেই।

হবিগঞ্জে চা শ্রমিকদের উচ্ছেদ করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

'স্পেশাল ইকনোমিক জোন'-এর নামে হবিগঞ্জের চান্দপুরের চা শ্রমিকদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ করার প্রতিবাদে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলা শাখা ১৩ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানববন্ধন করে। চা শ্রমিক ফেডারেশন সিলেট জেলার সংগঠক লাংকাট লোহারের সভাপতিত্বে এবং অজিত রায়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধন চলাকালীন সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ(মার্কসবাদী) নেতা এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, সুশান্ত সিনহা প্রমুখ।

সিলেটে স্মৃতিসৌধের দাবিতে সাইকেল র‍্যালি

স্বাধীনতার ৪৪ বছর পরও সিলেটে নেই কোনো স্মৃতিসৌধ। তাই শিশু কিশোর মেলা গত ২৬ মার্চ থেকে সিলেটে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের দাবিতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। সিলেটের বর্তমান কারাগারটি অতিদ্রুত স্থানান্তরিত হওয়ার কথা। ঐ স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ ও শিশুদের বিকাশ উপযোগী পার্ক নির্মাণের দাবিতে ইতোমধ্যে প্রায় তিনশ স্কুল ছাত্রের উপস্থিতিতে স্মৃতিসৌধের মডেল নির্মাণ প্রতিযোগিতা, প্রায় দশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি পেশ করাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। তার ধারাবাহিকতায় ১৬ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় সিলেট রেজিস্ট্রি মাঠ হতে সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হল। সাইকেল র‍্যালি উদ্বোধন করেন সিলেটের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অনিমেষ বিজয় চৌধুরী রাজু। উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ ব্যারিস্টার আরশ আলী, শিশু কিশোর মেলার উপদেষ্টা এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, ডা. ফাতেমা ইয়াছমিন ইমা প্রমুখ। বর্ণাঢ্য র‍্যালিটি রেজিস্ট্রি মাঠ হতে শুরু হয়ে বন্দর, চৌহাট্টা, আম্বরখানা, কাজীটুলা, জেলরোড হয়ে পুনরায় রেজিস্ট্রি মাঠে এসে মিলিত হয়। সাইকেল র‍্যালির আগে সকাল ৯টায় সুসজ্জিত র‍্যালির মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিজয় দিবস উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

ধারাবাহিক আন্দোলনের বিজয়

মদন মোহন কলেজকে সরকারিকরণের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অবিলম্বে কার্যকর কর

মদন মোহন কলেজকে সরকারিকরণের দাবিতে ২০০৭ সাল থেকে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। শুরুতে শত শত ছাত্রদের মতামতের ভিত্তিতে সরকারিকরেণ দাবি উত্থাপন করা হয়। এই আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় নানা মহলের বিরোধিতাই শুধু নয়, সংগঠনের নেতাকর্মীরা শারিরিকভাবেও আক্রান্ত হন। কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সহযোগিতার ফলে এই আন্দোলন গতিশীল হতে থাকে। সর্বশেষ গত ১৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী বরাবর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্মারকলিপি পেশ করা হয় এবং ১০ জানুয়ারি অধ্যক্ষ বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। দীর্ঘ ৯ বছরের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ২২ জানুয়ারি কলেজের হীরক জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে এসে প্রধানমন্ত্রী মদন মোহন কলেজকে সরকারিকরণের ঘোষণা দেন।

মদন মোহন কলেজকে সরকারিকরণের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করার দাবিতে ২২ জানুয়ারি বিকাল ৩টায় নগরীতে মিছিল-সমাবেশ করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখা। মিছিলটি সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে সিটি পয়েন্টে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। রেজাউর রহমান রানার সভাপতিত্বে এবং সঞ্জয় কান্ত দাসের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মদন মোহন কলেজ শাখার আহ্বায়ক লিপন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক রুবেল মিয়া, মিজানুর রহমান।

বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা অবিলম্বে কার্যকর করে মদন মোহন কলেজকে একটি সজীব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। এর সাথে সাথে সরকারিভাবে ছাত্র বেতন নির্ধারণ, শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণসহ আনুসঙ্গিক আয়োজন নিশ্চিত করতে হবে। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ সরকারিকরণের দাবি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

রেলের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ

রেল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি রেলের ভাড়া বৃদ্ধির যে সুপারিশ করেছে তার প্রতিবাদে বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলা ১৬ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। মিছিলটি সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে সিটি পয়েন্টে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলার সদস্য এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েবের সভাপতিত্বে এবং অনীক ধরের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মোখলেছুর রহমান, এড. উজ্জ্বল রায়, সঞ্জয় কান্ত দাস প্রমুখ।

শিক্ষক আন্দোলন : সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদা ও বেতন কাঠামো নিশ্চিত কর

(শেষ পৃষ্ঠার পর) শিক্ষকরা হচ্ছেন মানুষ গড়ার কারিগর। জীবনের উষালগ্নে তাঁদের হাত ধরেই জ্ঞানচর্চা শুরু হয়। ক্রমে আমরা আমাদের সমাজ, প্রকৃতিকে চিনতে শিখি। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসে সেই জ্ঞান আরও পরিপূর্ণতা পায়, অধিকতর দক্ষ মানুষ হিসেবে আমরা গড়ে উঠি। এভাবে মানুষ গড়ার পথে হেঁটে আমাদের দেশে বিখ্যাত হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, রোকেয়া, রমেশচন্দ্র মজুমদার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, গোবিন্দচন্দ্র দেব, আখলাকুর রহমান, আনোয়ার পাশা, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, ড. শামসুজ্জোহা প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দ। জ্ঞানের সাধনায় ও বিতরণে তাঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের কর্মকাণ্ড এই জাতির মনন গড়ে তুলতে অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছিল, পথকে আলোকিত করেছিল। কিন্তু পরাধীন দেশে আমাদের এই মহান শিক্ষকেরা প্রাপ্য সম্মান পাননি। স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে তাঁরা সেটা পাবার আশাও করেন নি। একারণেই সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজ শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন। মুক্তি সংগ্রামে ছাত্রদের উজ্জীবিত ও উৎসাহিত করেছিলেন। নিজেরাও শরিক হয়েছিলেন এই মহত্তর সংগ্রামে। কিন্তু স্বাধীনতার পর শিক্ষকদের সেই আকাঙ্ক্ষা কতটুকু পূরণ হয়েছে?

স্বাধীন দেশেও শিক্ষকসমাজ অবহেলিত। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা সবক্ষেত্রেই এই অবহেলার চিত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়। এবার শিক্ষকদের কয়েক ধাপ পদ অবনতির মাধ্যমে এই পরিস্থিতিকে আরও দুঃসহ করা হলো। একজন শিক্ষক যখন আর্থিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন তখন তাঁর পক্ষে নির্বিঘ্নে পাঠদান করা দুঃসাধ্য। বস্তুত আমাদের দেশে শিক্ষকদের বেতন পৃথিবীর মধ্যে নিম্নতম কয়েকটি দেশের সারিতে। এখানে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক-প্রফেসর বেতন পান (বর্তমান) ১১.০০০ থেকে ২৯,০০০ টাকা আর নতুন স্কেলে ২২,০০০ থেকে ৫৬,০০০ টাকা। অন্যদিকে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক পান ৭২,২০৯ থেকে ১,৬৮,৭৪৫ টাকা; নেপালে ২৮,১৯২ থেকে ৬৫,১৮৪; পাকিস্তানে ৬৫,১৮৪ থেকে ২,০৩,৭০০; শ্রীলঙ্কায় ১,০৫,৬৮০ থেকে ১,৮৬,৩৪৫; মালায়েশিয়ায় ২,৫৩,১৫৮ থেকে ৩,৬০,৩০৫; জাপানে ২,৪২,৭২৯ থেকে ৪,৫১,৮৮৮; যুক্তরাষ্ট্রে ৩,৭৩,৯১২ থেকে ৬,০১,৭৩০; কানাডা ৪,২৪,১৮৫ থেকে ৬,৫১,১৮৮; যুক্তরাজ্যে ৩,৩২,১৯৪ থেকে ৬,৮১,৯০৬ টাকা। কথায় কথায় যারা আমেরিকা-ইউরোপের উদাহরণ আনেন তারা এখন শিক্ষকদের বেতনের ক্ষেত্রে কি বলবেন? শিক্ষক সমাজের এই বেহাল অবস্থার কারণে পুরো শিক্ষাব্যবস্থা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, শিক্ষকদেরও ঠেলে দেয়া হচ্ছে 'যেভাবেই হোক টাকা রোজগারের' রাস্তায়। ফলে ক্ষুণ্ন হচ্ছে পেশাগত নৈতিকতাও। তাই আমরা মনে করি শিক্ষার স্বার্থেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সর্বোচ্চ ও স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের দাবিটি অত্যন্ত ন্যায্য।

সাথে সাথে একটি কথাও বলতে চাই, শুধু গ্রেড বৃদ্ধি কিংবা আমলাদের সমকক্ষ হলেই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মর্যাদা বাড়বে কি? শিক্ষকসমাজের কারও বক্তব্য শুনে আমাদের মনে হয়েছে, আমলাদের প্রতিহিংসার কারণেই শিক্ষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন, সম্মান পাচ্ছেন না। বাস্তবে ব্যাপারটা আদৌ সে রকম কি? আমলারা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের অংশ এবং রাষ্ট্রের পরিচালক সরকারের আজ্ঞাবহ। রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিই আমলাদের কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয় মাত্র। যে নীতি ও পদ্ধতি রাষ্ট্র গ্রহণ করে, আমলারা তা-ই কার্যকর করেন।

এ প্রসঙ্গে আমরা আরেকটি বিষয় সংশ্লিষ্ট সকলকে ভেবে দেখতে বলব – শিক্ষকদের মর্যাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা কিংবা বৃহৎ অর্থে শিক্ষা সম্পর্কিত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা তথা স্বায়ত্তশাসনের সাথে যুক্ত। স্বাধীনতার পর ৭৩-এর অধ্যাদেশ-এর মাধ্যমে চারটি বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হলেও নানা দুর্বলতাও রেখে দেয়া হয়েছিল। সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে সকল সরকারই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজেদের দলীয় সম্পত্তি বানানোর অপচেষ্টা চালিয়েছে। হস্তগত করেছে স্বায়ত্তশাসনের চেতনা এবং ভূলুণ্ঠিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগটুকুও রাখা হয়নি। এইক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষকের ভূমিকাও কম দায়ী নয়। তারা এতদিনের লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জিত সম্মান-স্বাধীনতাকে প্রশাসনিক-আর্থিক স্বার্থ-সুবিধার বিনিময়ে শাসকশ্রেণীর কাছে বিকিয়ে দিয়েছেন। তাই প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেন, 'যারা আন্দোলন করছেন, তারা সরকারের কাছে কি সুযোগ-সুবিধা নিয়েছেন তাও দেখতে হবে।' প্রধানমন্ত্রীর এমন দম্ভোক্তির পরও শিক্ষকদের নীরবতা তাদের অসহায়ত্বকে ফুটিয়ে তোলে।

একইসাথে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, আন্দোলনের একপর্যায়ে পে-কমিশনের চেয়ারম্যান ফরাসউদ্দিন বলেছিলেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষকদের স্বতন্ত্র বেতন স্কেল করা যাবে না।' এই মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবহ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার মানে কি আমরা সবাই জানি, রাষ্ট্র আর বরাদ্দ দেবে না, শিক্ষার্থীদের থেকে ব্যয়ের পুরো অর্থ আদায় করা হবে।

তাই একথা সহজেই বলা যায় শিক্ষকদের বেতন-ভাতার বিষয়টি রাষ্ট্রের শিক্ষা বাজেট এবং শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যুক্ত। শিক্ষকদের স্বতন্ত্র পে স্কেল না দেওয়া এবং শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ একই নীতির-ই ফলাফল। এই পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি, উচ্চশিক্ষার সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব রাষ্ট্রকে গ্রহণ করতে হবে। একইসাথে শিক্ষকসমাজের সর্বোচ্চ বেতন-কাঠামো ও সামাজিক মর্যাদাও সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। আজ সকল মানুষের শিক্ষার অধিকারকে সমুন্নত রাখতে হলে ছাত্র-শিক্ষকসহ সকলকে এই দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নাহলে গল্পের পণ্ডিতমশাইয়ের মতো অবস্থা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার চিরন্তন বাস্তবতা হিসেবে রয়ে যাবে।

উচ্ছেদ রুখে দাঁড়িয়েছে চা-শ্রমিকেরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) যাইবে না ... বাংলাদেশের সকল কৃষিজমির ওপর দেশের যেকোনো কৃষক বা কৃষিজীবীর অধিকার থাকিবে এবং খরিদ সূত্রে বা উত্তরাধিকার সূত্রে বা সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত বন্দোবস্ত সূত্রে তাহা ভোগদখলে রাখিবার অধিকার অক্ষুণ্ন থাকিবে ... দুই বা তিন ফসলি জমি সরকারি-বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো অবস্থাতেই অধিগ্রহণ করা যাইবে না;"

খসড়া আইনেও যে সুপারিশ করা হয়েছে তাতেও এই ভূমির ওপর চা-শ্রমিকদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। অথচ খসড়া আইনের এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না করে উল্টো ভূমি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করছে। উন্নয়নের জন্যই নাকি এই উচ্ছেদ! প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, শ্রমিকদের বাস্তুচ্যুত করে কার উন্নয়ন হবে? যুগের পর যুগ যে শ্রমিকরা খেয়ে না খেয়ে প্রাণ ধারণ করছে, মজুরি বৃদ্ধির মতো ন্যায়সঙ্গত দাবি মানা হচ্ছে না – এ বিষয়ে সরকারের কোনো পদক্ষেপ নেই, চা-শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ নেই, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ নেই – এইসব মৌলিক অধিকার পূরণ না করে ইকোনমিক জোন হলে শ্রমিকদের জীবনের উন্নতি হবে এর এতটুকু নিশ্চয়তা কে দেবে?

সত্য কথাটি হলো, এই এর দ্বারা লাভবান হবে ব্যবসায়ীরা। ইকোনমিক জোনে কর ও শুল্ক মওকুফসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয়ায় ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগ করবে। বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য এমনকি শ্রম আইন থেকে দায়মুক্তি দেয়ার ঘোষণাও দেয়া হয়েছে।

জমি থেকে উচ্ছেদ করে এখন আবার কর্মসংস্থান হবে বলে দরদ দেখানোর চেষ্টা করছে। এই শ্রমিকদের প্রতি দরদ যদি থাকতোই তাহলে তো এদের পথে বসানোর সর্বনাশা পরিকল্পনা নেয়া হতো না। আর ভাবখানা এমন যে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্যই ইকোনমিক জোন করা হচ্ছে। আসল কথাটি হলো শ্রমিক ছাড়া ইকোনমিক জোন চলবে কী করে? এমনিতেই নামমাত্র মজুরিতে কাজ করে চা-শ্রমিকরা, এখন জমি হারিয়ে উদ্বাস্তু হলে বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হয়ে অল্প মজুরিতে ইকোনমিক জোনে কাজ করবে। ফলে সরকার কর্তৃক প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা আর উচ্ছেদ হওয়া শ্রমিকদের সস্তা শ্রমকে কাজে লাগিয়ে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিরা অধিক মুনাফা লুটে নিয়ে যাবে। এর মাধ্যমে কার উন্নয়ন হবে শিল্পপতি-পুঁজিপতিদের নাকি জমি হারানো চা-শ্রমিকদের? তাই কর্মসংস্থান নয়, সস্তা শ্রম লুণ্ঠনের দ্বার অবারিত হবে।

আশার কথা চা-শ্রমিকরা সরকারের এই অন্যায় সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছেন। গত ১২ ডিসেম্বর জমি অধিগ্রহণের জন্য গেলে চা-শ্রমিকদের প্রতিরোধের মুখে ব্যর্থ হয় প্রশাসন। কর্মবিরতি, অবস্থান, সমাবেশ-স্মারকলিপি পেশের মধ্য দিয়ে এখনো আন্দোলন অব্যাহত আছে।

দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক

(শেষ পৃষ্ঠার পর) টাকা মজুরিতে কীভাবে চলে এই শ্রমিকের সংসার? নারী শ্রমিকরা সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পায় মাত্র ১০০-১২০ টাকা আর শিশু শ্রমিকরা সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত কাজ করে পায় তিন বেলা খাবার ও মাস শেষে ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা। নেই কোনো সাপ্তাহিক ছুটি বা জাতীয় দিবসে সরকারি ছুটি। এমনকি গত ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবসেও কাজ করতে হয়েছে সব শ্রমিককে। মুনাফার লোভে মালিকরা অমানুষিক পরিশ্রম করাচ্ছে। মুনাফার লোভ মালিকদের কতটা নৃশংস করে তোলে যে সারা জীবন বাঁধাই কারখানায় কাজ করলেও পুরাতন কাটিং মেশিনের ত্রুটিতে শ্রমিকদের হাত কেটে পড়ে গেলে সহযোগিতার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে, দু'মাস পরে কোনো টাকা না দিয়ে তাড়িয়ে দেয় দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিককে।

এই অন্যায় নির্যাতনের প্রতিকার দরকার। যে মালিকী ব্যবস্থা সভ্যতার কারিগর শ্রমিকদের অমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য করছে সেই মালিকী ব্যবস্থার অবসান দরকার। তাই বাংলাদেশ শ্রমিক-কর্মচারী ফেডারেশন বাঁধাই শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা ও মর্যাদার জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। তার অংশ হিসেবে ২৫ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ্ পার্কের সামনে সমাবেশ এবং পরবর্তীতে শ্যামবাজার, সূত্রাপুর, লক্ষ্মীবাজার, বাংলাবাজারে শ্রমিকদের এক মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিল শেষে ৬৫, প্যারীদাস রোডস্থ বাংলাদেশ পুস্তক বাঁধাই ব্যবসায়ী সমিতি কার্যালয়ে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সমাবেশে ফেডারেশনের সূত্রাপুর থানা শাখার সংগঠক রাজীব চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড জহিরুল ইসলাম, ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, ছাত্রনেতা মাসুদ রানা ও বাঁধাই শ্রমিক নেতা জামিল ভূঁইয়া, মানিক হোসেন, শাহিদুল ইসলাম, মনির হোসেন, যাদু মিয়া প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বাঁধাই শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা (রোজ) কাজের মজুরি ২৫০ টাকা, সবেতন সাপ্তাহিক ছুটি, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের নীতিমালার দাবি আন্দোলনের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। শ্রমজীবি মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া এই সমাজে বেঁচে থাকার আর কোনো বিকল্প রাস্তা নেই। সেই দাবিতে সকলকে একসাথে লড়াইয়ে নামতে হবে।

একই দাবিতে ৮ জানুয়ারি '১৬ বিকাল ৪টায় বাহাদুর শাহ্ পার্কের সামনে থেকে মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে রাজীব চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড উজ্জ্বল রায়, ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, ছাত্রনেতা মাসুদ রানা ও শ্রমিক প্রতিনিধি জামিল ভূঁইয়া, মানিক হোসেন প্রমুখ। বক্তারা বলেন, "গত ২০১৫ সালেও মজুরি বাড়েনি। ২০১৪ সালে বেড়েছিল ১০ টাকা প্রতি রোজে। কিন্তু গত দুই বছরে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম, বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া বেড়েছে অনেকগুণ।"

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসন কর

(শেষ পৃষ্ঠার পর) হঠাৎ করেই 'অনার্স রেগুলেশন ২০১০' চালু হয় এবং সিলেবাসের কলেবর দ্বিগুণ করা হয়। এই সৃজনশীল ব্যবস্থায় ২১০ দিন ক্লাসের বাধ্যবাধকতা থাকলেও কারমাইকেলের মত ঐতিহ্যবাহী বড় কলেজে গত ৩-৪ সেশনে বিভিন্ন বিভাগে গড়ে ৪০/৪৫ দিনের বেশি ক্লাস হয়নি। এ থেকে বোঝা যায় অন্য কলেজগুলোর অবস্থা কত করুণ! আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছি সেশনজট নিরসন করতে পর্যাপ্ত শিক্ষক, ক্লাসরুম, স্বতন্ত্র পরীক্ষা হলসহ প্রয়োজনীয় আয়োজন সম্পন্ন করতে কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এসবের তোয়াক্কা না করে ক্রাশ প্রোগ্রাম চালু করেছে। ফলে কলেজগুলোর পাঠদান প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়েছে এবং এটি এখন শুধু পরীক্ষা গ্রহণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে সংকটমুক্ত করে একটা প্রকৃত মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে প্রয়োজন স্বতন্ত্র পরীক্ষাহল ও ক্লাসরুম নির্মাণ, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় আয়োজন সম্পন্ন করে ২১০ দিন ক্লাস নিশ্চিত করা, ৪ বছরের সমন্বিত কারিকুলাম নির্ধারণ। মার্স্টাস ভর্তির নতুন নিয়ম বাতিল করে পুরাতন নিয়ম বহাল রেখে শিক্ষা জীবন রক্ষা করা, আবাসন সংকট নিরসনে নতুন হল নির্মাণ, লাইব্রেরি সেমিনারে পর্যাপ্ত বই, পরিবহন সংকট নিরসনে নতুন বাস ক্রয় ও নতুন রুটে বাস চালু করা। ক্যাম্পাসগুলোতে স্থায়ী ব্যাংক শাখা চালু ও প্রয়োজনীয় ঔষধ, সার্বক্ষণিক ডাক্তারসহ স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু, যে সমস্ত কলেজে প্রিভিয়াস নেই সেখানে অবিলম্বে (প্রিভিয়াস কোর্স) চালুসহ অনার্স ১ম বর্ষের রুটিনে প্রত্যেক পরীক্ষার মাঝে সময় বাড়িয়ে নতুন রুটিন দিতে হবে।

নোয়াখালি : পর্যাপ্ত ক্লাস নেয়া, স্বতন্ত্র পরীক্ষার হল চালু, পরীক্ষার প্রস্তুতির পর্যাপ্ত সময়ের দাবীতে ছাত্র ফ্রন্ট নোয়াখালী সরকারি কলেজ শাখার উদ্যোগে ১১ জানুয়ারি সকাল ১১টায় নোয়াখালী কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ছাত্র ফ্রন্ট নোয়াখালী সরকারি কলেজ শাখার কাউন্সিল প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক ফখরুল ইসলাম ফরহাদের সভাপতিত্বে এবং সদস্য দিপন মজুমদারের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট জেলা কমিটির সদস্য কাজী জহির উদ্দিন এবং কলেজ শাখার সদস্য জহিরুল হক ফয়সল ও প্রশান্ত মজুমদার। বক্তারা বলেন, প্রায় ১৪০০০ শিক্ষার্থীর বিদ্যাপীঠ নোয়াখালী সরকারি কলেজ পরীক্ষা ও আনুষ্ঠানিক বন্ধের কারণে বছরে ২৭৭ দিন ক্লাস বন্ধ থাকে। ফলে সর্বোচ্চ ৮৮ দিন ক্লাস হওয়ার সুযোগ থাকলেও শিক্ষক, ক্লাসরুম ও আয়োজনের সংকটে তাও হয় না। অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র স্বার্থ বিরোধী 'রেগুলেশন এ্যাক্ট ২০১০' এবং শিক্ষা বিনাশী 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' চালু করেছে। ফলে শিক্ষায় জটিলতা ও শিক্ষা জীবনের অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

বক্তারা অভিযোগ করেন, শিক্ষার বাণিজ্যিকিরণের অংশ হিসাবে সরকারি কলেজে আবাসন, শিক্ষক, ক্লাসরুম, নতুন বই, পরিবহন, বিশুদ্ধ পানি ও টয়লেট সংকটের সমাধান করা হচ্ছে না। নামে-বেনামে ফি আদায় ও ফি বৃদ্ধি করছে। তারা শিক্ষার অধিকার আদায়ে ও শিক্ষক সংকটের সমাধানে ছাত্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দি পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক

মজুরি ২৫০ টাকা করার দাবি শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের

বাঁধাই শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের মজুরি(রোজ) কমপক্ষে ২৫০ টাকা, সবেতন সাপ্তাহিক ছুটি, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের নীতিমালা প্রণয়নের দাবিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে ধারাবাহিক আন্দোলন চলছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু সরকার তাদের দাবির প্রতি কর্ণপাত করছে না। বছরের প্রথম দিনে স্কুল শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌছে দেওয়ার কৃতিত্ব জাহির করছে সরকার। কিন্তু এর পশ্চাতে আছে বাঁধাই শ্রমিকদের রক্ত জল করা শ্রম, জীবনের অনেক বঞ্চনার দীর্ঘশ্বাসের গোপন কাহিনী। যে শ্রমিকরা বই বাঁধাই করে, সেই শ্রমিকরাই তা পড়তে পারে না। সারাদিন অন্ধকার ঘুপচিতে কাজ করে । শিক্ষাকে তুলনা করা হয় আলোর সাথে – কিন্তু এই আলো শোষণ আর দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেদ করে অন্ধকার ঘুপচিতে পৌঁছায় না কোনোদিন। সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু মনুষ্যোচিত মজুরিও জোটে না। বর্তমানে বাড়ি ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, গ্যাস বিদ্যুতের যেভাবে মূল্য বেড়েছে, চাল ডালসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির সময়ে মাত্র ১৫০-১৭০ *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল বিদ্যুৎপ্রকল্প বাতিলের দাবি

পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ

যে পরিবেশ মন্ত্রণালয় পর পর ছয় বার রামপাল প্রকল্প অনুমোদন দেয়নি, সরকারের চাপের মুখে সেই পরিবেশ মন্ত্রণালয় রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় বলে ছাড়পত্র দিয়েছে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের এই অনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা।

সুন্দরবনের পাশে রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র বাতিলের দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ১৩ জানুয়ারি দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে সচিবালয়ের ৫ নম্বর গেটের কাছে এ বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মোর্চার বর্তমান সমন্বয়ক অধ্যাপক আবদুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)র নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, গণসংহতি আন্দোলনের আবুল হাসান রুবেল, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বায়ক কমরেড হামিদুল হক, ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের নজরুল ইসলাম।

এর আগে সাড়ে ১১টার দিকে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে পুরানা পল্টন হয়ে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার নেতাকর্মীরা। তাদের মিছিল সচিবালয়ের ৫ নম্বর গেট সংলগ্ন রাস্তায় পৌঁছালে সেখানে তাদের বাধা দেয় পুলিশ।

আঞ্চলিক কার্যালয় ঘেরাও

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকট নিরসন কর

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট রংপুর বিভাগের উদ্যোগে ১৩ জানুয়ারি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হয়। সকাল সাড়ে ১১টায় রংপুর প্রেসক্লাব থেকে মিছিল শুরু হয়ে আঞ্চলিক কার্যালয় অভিমুখে যাত্রা করে। আঞ্চলিক কার্যালয় ঘেরাওকালে পরিচালকের কাছে ৬ দফা দাবি সম্মলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। মিছিল পূর্ব সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা জেলা সভাপতি নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী। পরিচালনা করেন রংপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক রোকনুজ্জামান রোকন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কারমাইকেল কলেজ সভাপতি আবু রায়হান বকশি, গাইবান্ধা কলেজ সভাপতি পরমানন্দ দাস, দিনাজপুর কলেজ সভাপতি গোবিন্দ রায়, কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ সভাপতি স্বপন রায়, ঠাকুরগাঁ সরকারি কলেজ সভাপতি জাকির হোসেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, উচ্চ শিক্ষায় চরম দায়িত্বহীনতার শিকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজগুলোর পড়ানোর সমস্ত আয়োজন না করে এবং নতুন কোনো আয়োজনের ব্যবস্থা না করে *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

স্পেশাল ইকোনমিক জোনের নামে উচ্ছেদ রুখে দাঁড়িয়েছে চা-শ্রমিকেরা

সারাদেশের উন্নয়নের ঢেউ এবার আছড়ে পড়েছে হবিগঞ্জে। আর ঢেউয়ের তোড়ে বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হতে চলেছে চুনারুঘাটের চান্দপুর চা-বাগানের ২ হাজার শ্রমিক। শুধু এই শ্রমিকরাই নয়, এর সাথে তাদের পরিবারের আরো প্রায় আট হাজার সদস্য উদ্বাস্তু হবে। সরকার সম্প্রতি চান্দপুর ও বেগমখান বাগানের ৫১১ একর জমি 'স্পেশাল ইকোনমিক জোন' প্রতিষ্ঠার নামে বেজার কাছে হস্তান্তর করেছে। ভূমি মন্ত্রণালয় এই জমিকে অকৃষি খাস জমি দেখিয়ে বন্দোবস্ত দিয়েছে। বলা হয়েছে এই জমি ব্রিটিশ কোম্পানি ডানকান ব্রাদার্সের কাছে লিজ দেয়া ছিল, তা বাতিল করে 'স্পেশাল ইকোনমিক জোন'-এর জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ইতোমধ্যে বলেছে, চা শ্রমিকরা এতদিন সরকারি খাস জমিতে অবৈধভাবে চাষাবাদ করেছেন। এটি একটি সর্বৈব মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়।

চা শ্রমিকদের ইতিহাস কম-বেশি আমরা সবাই জানি। ব্রিটিশ আমলে এঁদের পূর্বপুরুষদের জবরদস্তি করে ধরে আনা হয়েছিল, এঁদেরকে পশুর মতো খাটানো হয়েছে, এঁদের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে জঙ্গল কেটে সাফ করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজকের এই চা-বাগান। শুধু নয়নাভিরাম সৌন্দর্যই নয়, এই চা আজকে বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসলও বটে। কিন্তু শতাব্দী পার হয়ে গেলেও চা-শ্রমিকদের ভাগ্যের চাকা ঘোরেনি, জীবনে উন্নতির ছোঁয়া লাগেনি। বরং যুগের পর যুগ বংশানুক্রমিকভাবে চা-শ্রমিকের 'ভাগ্য'কেই বরণ করতে হয়েছে এঁদের। এখনো উদয়াস্ত পরিশ্রম করে মাইনে মেলে মোটে দৈনিক ৭৯ টাকা। অনেক আন্দোলন, জুলুম নির্যাতনের পর দৈনিক ৬ টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবি মানলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। এই টাকায় একজন মানুষের তিনবেলা আহারই তো জুটে না। জীবনের অন্যান্য চাওয়া পাওয়া না হয় বাদই গেল। শিক্ষা নেই, চিকিৎসা নেই – মানবিক জীবনের সমস্ত রকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত। উপরন্তু এখন তাদের নিজস্ব ভূমি থেকে বিতাড়িত হওয়ার উপক্রম। দেড় শতাব্দী আগে জঙ্গল কেটে যে ভূমিকে বাসযোগ্য, আবাদযোগ্য করেছে এই শ্রমিকরা, তাদের পূর্বপুরুষরা সেই ভূমির মালিকানা কেন তাদের হবে না? এত স্বল্প মাইনেতে জীবন চলে না তাই এই জমিতে সবজি আলু টমেটো ধান ইত্যাদি চাষ করে কোনোমতে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে চা-শ্রমিকরা। কিন্তু এই জমিকে অকৃষি জমি হিসেবে দেখিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় ও বেজা নির্লজ্জ মিথ্যাচার করে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

সরকারের 'কৃষিজমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে আইন,২০১৫'-এর খসড়ার ৪ ধারায় বলা হয়েছে, "কোনো কৃষিজমি নষ্ট করিয়া আবাসন বাড়িঘর, শিল্প-কারখানা ইটের ভাটা বা অন্য কোনো অকৃষি স্থাপনা কোনোভাবেই নির্মাণ করা *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সাম্প্রতিক শিক্ষক আন্দোলন প্রসঙ্গে

সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদা ও বেতন কাঠামো নিশ্চিত কর

সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পাদটীকা' গল্পের পণ্ডিত মশাইয়ের কথা মনে আছে? পণ্ডিত মশাই তার ছাত্রদের প্রশ্ন করেছিলেন – 'আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী মিলে আমরা আটজন। আমাদের সকলের জীবন ধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। আর লাটসাহেবের তিন ঠ্যাঙ্গা কুত্তাটার পিছনে মাসে পচাত্তর টাকা খরচ হয়। এখন বল তো দেখি, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের ক'টা ঠ্যাঙ্গের সমান?' পণ্ডিত মশাইয়ের এই আর্তনাদমিশ্রিত প্রশ্নের জবাব ছাত্ররা দিতে পারেনি। বৃটিশযুগে শিক্ষকসমাজের দৈন্যদশার চিত্র এমনই শ্লেষাত্মক ভাষায় তুলে ধরেছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলী। এর মাধ্যমে বোঝা যায় বৃটিশদের শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল। সময় পেরিয়ে গেছে। কিন্তু শিক্ষকদের দৈনদশার এই চিত্র কি পাল্টেছে? আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত যারা গড়ে দেন সেই প্রাথমিক শিক্ষকদের মর্যাদা আজও তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। শুধু তাই নয়, তাঁদের বেতন শুরু হয় চার হাজার ৭০০ টাকা এবং সব মিলিয়ে মাসে তাঁরা পান আট হাজার টাকা। একজন সরকারি গাড়িচালকের বেতনও ১০ হাজার টাকার বেশি। সম্প্রতি সংবাদপত্রের জন্য অষ্টম ওয়েজ বোর্ডের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, সেখানে একজন পিয়নের বেতনও এর দ্বিগুণ। (তথ্যসূত্র : প্রথম আলো) এবছর নতুন করে যে অষ্টম বেতন কাঠামো ঘোষণা করা হয়েছে তাতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন সচিবদের তুলনায় কয়েক ধাপ নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সিলেকশন গ্রেড বাতিল করা হয়েছে। সরকারি কলেজে অধ্যাপক পদে কর্মরত শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে, সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল বাদ দেয়া হয়েছে।

এই যখন অবস্থা, তখন বৈষম্যপূর্ণ অষ্টম বেতন কাঠামো বাতিলের দাবিতে গত কয়েক মাস ধরে শিক্ষকরা লাগাতার আন্দোলন করে আসছেন। সরকার দাবি তো মানেইনি বরং আন্দোলনকারী শিক্ষকদের নিয়ে নানা সময় মন্ত্রী এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রীও কটাক্ষ করেছেন। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'জ্ঞানের অভাবে শিক্ষকরা আন্দোলনে নেমেছেন'। শিক্ষকদের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় অর্থমন্ত্রী দুঃখ প্রকাশ করলেও কিছুদিন পরেই প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত কঠোর ভাষায় শিক্ষকদের শাসিয়েছেন। বলেছেন, 'আমি মনে হয় একটু বেশি দিয়ে ফেলেছি। কমিয়ে দেয়া বোধ হয় ভালো ছিল।' দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়ে শিক্ষকদের বিষয়ে এ কেমন আচরণ! দেশের কোটি কোটি মানুষের শ্রমে-ঘামে পরিপুষ্ট হয় রাষ্ট্রের যে কোষাগার, তার টাকা জনগণের স্বার্থে ব্যয়িত, শিক্ষা-শিক্ষকদের জন্য ব্যয়িত হবে তাই তো ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মনে হবে প্রধানমন্ত্রী যেন ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকদের অর্থ দিচ্ছেন! শিক্ষকসমাজকে এভাবে অপমানিত করে তাঁর এই বক্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। *বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)* কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.sammobad.org। ই-মেইল: mail@spbm.org